ছাগল ও ভেড়া পালনঃ

মডিউল - ২৭ ঃ
ছাগল পালনের প্রাথমিক বিষয়াবলী

২৭.১ ঃ দুগ্ধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে ছাগল পালনের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের দুগ্ধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে ছাগল পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন দুগ্ধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে ছাগল পালনের গুরুত্বসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ছাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । ছাগলের দুধ একটি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য পানীয় । স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, আমিষ, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদান ছাগলের দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় । গাভীর দুধের চর্বি কণার তুলনায় আকারে ছোট হওয়ায় ছাগলের দুধের পরিপাচ্যতা বেশী । বাড়ন্ত শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীর জন্য ছাগলের দুধ উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য । ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শিশু ও প্রসূতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ যা গাভীর দুধের তুলনায় ছাগলের দুধে বেশী থাকে । সামান্য ক্ষারীয় হওয়ায় গ্যাস্ট্রিক আলসার বা এসিডিটিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য সহজপাচ্য পানীয় হিসাবে ছাগলের দুধ পান করা হয় । হাঁপানী রোগের ঔষধ হিসাবে কোথাও কোথাও ছাগলের দুধ বিবেচিত ।

ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় প্রাণীজ আমিষ । বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপালসহ বিশ্বের অনেক দেশে ছাগলের মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের মাংস পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন জাতের ছাগলের মাংসের চেয়ে সুস্বাদু বলে দাবী করা হয়ে থাকে । ধর্ম বিশ্বাসের কারণে প্রাণীজ আমিষের উৎস হিসাবে পৃথিবীর অনেক দেশে গরুর মাংসের তুলনায় ছাগলের মাংসের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যায় । এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, আকীকা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ছাগল জবাই করে ভুড়িভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে ।

দুধ ও মাংস উৎপাদন ছাড়াও পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদনে ছাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া হতে উন্নতমানের চামড়াজাত পণ্য তৈরী হয় । বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়ার কদর বিশ্বজোড়া । শীত প্রধান দেশের ছাগলের লম্বা লোম পশমিনা, শাল, সোয়েটার, হ্যাট, কার্পেট, স্যুট ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এ্যাংগোরা জাতের ছাগলের লোম হতে তৈরী হয় সাদা ও সোনালী মোহেয়ার (Mohair)।

ছাগলের দুধ, মাংস, চামড়া, পশম ও মলমূত্রের বহুমুখী ব্যবহার একে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদে পরিণত করেছে । ছাগল পালনে স্বল্প পুঁজি, স্বল্প জায়গা এবং কম খাদ্য খরচের প্রয়োজন হয় । আত্মকর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ছাগল হতে পারে একটি অন্যতম হাতিয়ার ।

২৭.২ ঃ বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

বাংলাদেশে ছাগল পালনের সুবিধাসমূহঃ

- বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল স্বল্প ব্যয়ে ছাগল পালনের জন্য খুবই উপযুক্ত । গ্রামের বসতবাড়িতে ২-৪ টি ছাগল পালন করা লাভজনক । বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৭৬% এলাকা ছাগল পালনের উপযোগী ।
- ছাগল অপ্রচলিত খাদ্য যেমনঃ কাঁঠাল পাতা, বাঁশ পাতা, কলা পাতা, হিজল পাতা এমনকি বসতবাড়ির আশেপাশের লতাপাতা ও সামান্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম । ফলে ছাগলের খাবার জোগাড় করা তেমন কষ্টসাধ্য নয় ।
- যেসব খামারীর গাভী পালন করার সামর্থ নেই তারা অনায়াসে ২-৪ টি ছাগল পালন করতে পারে । স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষী, গ্রামের দুস্থ মহিলা বা ছোট ছোট বালক বালিকারাও বাড়ির আশেপাশে, ক্ষেতের ধারে, রাস্তার পাশে ছাগল চড়িয়ে পালন করতে পারে ।
- ছাগলের রোগ বালাই অন্যান্য গবাদিপ্রাণির তুলনায় কম হওয়ায় ছাগল পালন লাভজনক ।
- বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল বছরে ২ বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবাওে ২-৪ টি করে বাচ্চা দেয় বলে এ জাতের ছাগল পালন লাভজনক ।
- দেশে ও দেশের বাইরে ছাগলের মাংস, দুধ ও চামড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । তাই এগুলো বাজারজাতকরণ সহজসাধ্য ।
- ছাগল খামার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের ঝুঁকি অন্যান্য গবাদি প্রাণির তুলনায় কম ।

বাংলাদেশে ছাগল পালনের সমস্যাসমূহঃ

- ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে খামারীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ।
- ছাগলের বিভিন্ন রোগ দমনে প্রস্তুতিমূলক ও কৌশলগত ব্যবস্থার অভাব যেমনঃ কৃমি নাশক না খাওয়ানো, যথাসময়ে টিকা প্রদান না করা ইত্যাদি ।
- স্ক্যাভেঞ্জিং, সেমি-ইন্টেনসিভ এবং ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল উৎপাদনের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।
- নীতিমালাহীন অবাধ সংকরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের কৌলিক মানের বিনাশ ।
- ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকর সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনার অভাব ।

২৭.৩ ঃ ছাগলের বিভিন্ন জাত

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাংস, দুধ, চামড়া ও পশম উৎপাদনের জন্য অনেক উন্নত জাতের ছাগল রয়েছে । নিচে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ এই শ্রেণীর ছাগলের মাংস সুস্বাদু ।

জাতের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দৈহিক ওজন
১. ব্ল্যাক বেঙ্গল	বাংলাদেশ, ভারত	১৫-৩০ কেজি
২. বোয়ার	দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন	৭০-৯৫ কেজি
৩. দামানি	পাকিস্তান, ভারত	২০-২৫ কেজি
৪. বিটাল	পাকিস্তান, ভারত	৪৫-৬৫ কেজি

টেবিল ২৭-১ঃ মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

এ ছাড়া অন্যান্য সকল জাতের ছাগলের মাংসই ভক্ষণযোগ্য ।

চিত্র-২৭.১ঃ বোয়ার জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.২ঃ বোয়ার জাতের ছাগল

দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ ল্যাকটেশন পিরিয়ডে এই শ্রেণীর ছাগী হতে প্রতিদিন গড়ে ১-৪ লিটার দুধ পাওয়া যায় ।

চিত্র-২৭.৩ঃ সানেন জাতের ছাগল

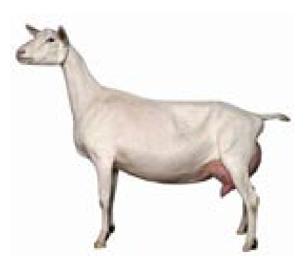
চিত্র-২৭.৪ঃ সানেন জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৫ টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৬ঃ টোগেনবার্গ জাতের ছাগল

দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের জাতের উদাহরণঃ

জাতের নাম	প্রাপ্তি স্থান	দৈহিক ওজন	ছাগীর দৈনিক দুধ উৎপাদন	প্রতি ল্যাকটেশনে দুধ উৎপাদন
১. যমুনাপাড়ি (রাম ছাগল)	ভারত, বাংলাদেশ	৪৫-৮০ কেজি	২-৪ লিটার	৬১৮ লিটার
২. সানেন	হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র	৬৫-৯৫ কেজি	৩-৫ লিটার	১৫০০ লিটার
৩. অ্যাংলো নুবিয়ান	ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	৬০-৭০ কেজি	২-৩ লিটার	৭৭৪ লিটার
৪. টোগেনবার্গ	সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র	৫০-৬৫ কেজি	১ লিটার	৫০০ লিটার
৫. দামাসকাস	সিরিয়া, লেবানন	৫০-৬০ কেজি	২-৩ লিটার	৫২৫ লিটার
৬. বারবারি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	৩৫-৪০ কেজি	১-২ লিটার	১২০-১৫০ লিটার
৭. ব্রিটিশ আলপাইন	ব্রিটেন, ইউরোপ	৬০-৬৫ কেজি	৯০০-১৩০০ মি.লি.	২১০-২৭৫ লিটার

টেবিল ২৭-২ঃ দুধ উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

চিত্র-২৭.৭ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

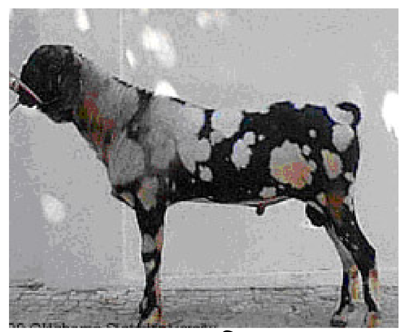

চিত্র-২৭.৮ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.৯ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১০ঃ অ্যাংলো নুবিয়ান জাতের ছাগল

চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ এই শ্রেণীর ছাগলের চামড়া দিয়ে উন্নতমানের চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় ।

জাতের নাম	প্রাপ্তিস্থান	দৈহিক ওজন
১. ব্ল্যাক বেঙ্গল	বাংলাদেশ, ভারত	১৫-৩০ কেজি
২. মালাবার	ভারত	৩৫-৪০ কেজি
৩. বারবারি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	৩৫-৪০ কেজি
৪. দামাসকাস	সিরিয়া, লেবানন	৫০-৬০ কেজি

টেবিল ২৭-৩ঃ চামড়া উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

<u>পশম উৎপাদনকারী ছাগলের জাতঃ</u> এই শ্রেণীর ছাগলের লোম হতে উন্নতমানের দামী পোশাক ও গরম কাপড় তৈরী করা হয় ।

উদাহরণঃ

জাতের নাম	প্রাপ্তিস্থান	লোম/পশমের নাম
১. অ্যাংগোরা	তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র	মোহেয়ার
২. কাশ্মিরী	ভারত	ক্যাশমেয়ার
৩. মেরাডি	উত্তর ভারত, পাকিস্তান	ক্যাশমেয়ার

টেবিল ২৭-৪ঃ পশম উৎপাদনকারী ছাগলের বিভিন্ন জাতের বিবরণ

চিত্র-২৭.১১ঃ অ্যাংগোরা জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১২ঃ অ্যাংগোরা জাতের ছাগল

আমাদের দেশে সচরাচর ছাগলের দুটি জাত দেখা যায় । এগুলো হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও রাম ছাগল বা যমুনা পাড়ি ছাগল ।

২৭.৪ ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

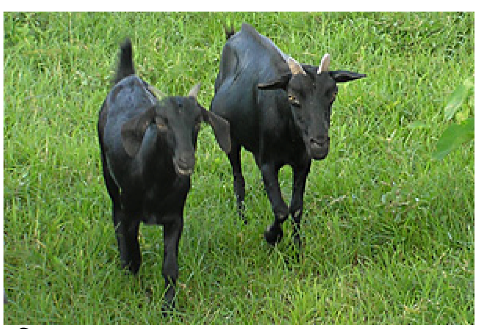

চিত্র-২৭.১৩ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১৪ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণতঃ খাটো । উচ্চতা ১৬-২০ ইঞ্চি ।
- এদের দেহ নাম কালো লোম দ্বারা আবৃত । তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংএর ছাগলও দেখা যায়।
- এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল ।
- এদের শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো ।

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি । পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ে ঘটে । ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় । ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় । বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয় ।
- এ জাতের ছাগল প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা জন্ম দেয় ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর ওলান ছোট ।
- ল্যাকটেশন পিরিয়ডে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যান্ত সুস্বাদু । একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি ভক্ষণযোগ্য মাংস পাওয়া যায় ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে । একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায় ।

২৭.৫ ঃ যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

চিত্র-২৭.১৫ঃ যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল

চিত্র-২৭.১৬ঃ যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল

যমুনা পাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- যমুনা পাড়ি ছাগলের শরীরের গঠন লম্বাটে । এদের পা বেশ লম্বা; পিছনের পায়ের পেছনে লম্বা লোম থাকে ।
- এদের কান লম্বা ও ঝুলন্ত । সাধারণতঃ ২০-২৫ সে.মি. ঝুলন্ত কান দেখা যায়।
- ছাগীর ওলান বেশ বড়, সুগঠিত ও ঝুলন্ত । বাটগুলো মোটা ও লম্বা ।
- শরীরের উচ্চতা ৩২-৪০ ইঞ্চি ।
- যমুনা পাড়ি জাতের পাঁঠার ওজন গড়ে ৭৫-১০০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৫০-৭৫ কেজি হয়ে থাকে।
- এরা দেরীতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ।
- যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী বছরে একবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গর্ভধারণ করে এরা সাধারণতঃ একটি বাচ্চা প্রসব করে ।
- ল্যাকটেশন পিরিয়ডে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগী গড়ে প্রতিদিন ২-৪ লিটার দুধ দেয় । প্রতি ল্যাকটেশনে এরা সর্বোচ্চ ৬১৮ লিটার দুধ দিয়ে থাকে । ৪০০-৫০০ মি.লি. দুধ দেয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাগলছানার চাহিদা পূরণ করতে পারে না ।

- এদের মাংস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মত সুস্বাদু নয় এবং চামড়াও উন্নতমানের নয় । তবু দুধ ও মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এদেশে যমুনা পাড়ি জাতের ছাগল পালন করা হয় ।

মডিউল - ২৮ ঃ
ছাগল খামার স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

২৮.১ ঃ বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

একটি ছাগল খামার স্থাপনের পূর্বে বিভিন্ন ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন । মূলতঃ কোন খামারে ছাগলে সংখ্যা, খামারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, খামার মালিকের পুঁজি, বিচরণ ভূমি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ছাগল পালন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৫-২০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি ছাগলকে দৈনিক গড়ে ১.৫-২.০ কেজি কাচা ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন । ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার, মুক্তভাবে ছাগল পালন, সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইন্টেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ইন্টেগ্রেটেড/সমন্বিত খামার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । নিম্নে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

১. পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার

বৈশিষ্ট্যঃ

- খামারে ছাগলের সংখ্যা ২-৫ টি
- ছাগলের জন্য আলাদা কোন বাসগৃহের প্রয়োজন হয় না । সাধারণতঃ গোয়াল ঘরে বা খামারীর শোয়ার ঘরে বা বসতঘরের পাশের বারান্দায় ছাগলকে রাখা হয় ।
- বসত ঘরের আশে পাশের পতিত জমি ও ক্ষেতের আইলের ঘাস হতে ছাগলের খাদ্যের সংস্থান হয় ।
- তবে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে গমের ভূষি, চালের কুড়া, ছোলার ভূষি, ভাতের মাড়, কাঁঠাল পাতা প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।

সুবিধাঃ

- অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় বলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র খামারী, প্রান্তিক চাষী এবং উচ্চ বিত্ত কৃষক সকলেই এ ধরণের খামার করতে পারেন ।
- এ ধরণের খামার স্থাপনে অল্প জায়গা এবং ব্যবস্থাপনায় অল্প শ্রম প্রয়োজন হয় ।
- বিনিয়োগ অল্প বলে এ ধরণের খামারে ঝুঁকির পরিমানও কম ।
- এক সাথে অল্প সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে এদের ব্যবস্থাপনা সহজসাধ্য । এদের রোগ ব্যাধিও তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং উৎপাদন ভাল হয় ।
- সংখ্যা কম হওয়ায় বাজারজাতকরণও তুলনামূলকভাবে সহজ ।

অসুবিধাঃ

- অল্প সংখ্যক ছাগল পালনের কারণে বাৎসরিক আয় কম হয় । তাই একক পেশা হিসাবে গ্রহণের জন্য এ ধরণের ছাগল পালন পদ্ধতি উপযুক্ত নয় ।

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালন করা হয় না বলে অনেক সময় ছাগলের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে কম অর্থ বিনিয়োগ করা হয় । ফলে উৎপাদন অনেক সময় আশানুরূপ হয় না ।

আয়ঃ

- এ ধরণের খামার হতে বছরে ১২-১৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব ।

২. মুক্তভাবে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ

- খামারে ছাগলের সংখ্যা ৮-১০ টি
- বসত ঘরের আশে পাশের অনাবাদি জমি, পতিত জমি যেমনঃ রেল লাইনের ধার, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেলার মাঠ, পাহাড়ী ভূমি, নদীর চর প্রভৃতি জায়গায় মুক্তভাবে সারাদিন ছাগল চরানো হয় ।
- শুধু রাতের বেলায় ছাগলকে বাড়ীতে নেওয়া হয় । এসময় শুধুমাত্র দানাদার খাবার ছাগলকে সরবরাহ করা হয় ।

সুবিধাঃ

- পতিত/অনাবাদি জমিতে মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের জন্য আলাদাভাবে ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না ।
- খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ কম হয় ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রোগ-বালাই তুলনামূলকভাবে কম হয় ।

অসুবিধাঃ

- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার কাজে নজরদারি করতে হয় । নতুবা ছাগল হারিয়ে যাওয়ার বা চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ানোর কারণে অনেক সময় ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে । এর ফলে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে ।
- দেশব্যাপী নিবিড় কৃষি কাজের কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের অধিকাংশ স্থানে এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা দুরুহ ।
- মুক্তভাবে চরে বেড়ায় বলে ছাগলের পরিকল্পিত প্রজনন সম্ভব নাও হতে পারে ।

আয়ঃ

- এ ধরণের খামার হতে বছরে ২৫-৩৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব ।

৩. সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ

- এ ধরণের পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় । খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল ।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় ।
- ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাচা ঘাস সরবরাহ করা হয় ।

সুবিধাঃ

- এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ।
- খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয় ।

অসুবিধাঃ

- বিনিয়োগ বেশী করতে হয় বলে স্বল্প পুঁজির খামারীর জন্য এই পদ্ধতি কিছুটা ব্যয় বহুল ।
- এক সাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে খরচ বেশী হয় ।

আয়ঃ

- বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল । বিনিয়োগ যত বেশী হবে অর্থ্যাৎ যত বেশী সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশী হবে ।

৪. ইন্টেনসিভ/নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বৈশিষ্ট্যঃ

- এই পদ্ধতিতে খামারে শতাধিক হতে সহস্রাধিক ছাগল পালন করা সম্ভব । বিনিয়োগের পরিমানের উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল ।
- এই পদ্ধতিতে ছাগলকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয় এবং কাচা ঘাস, দানাদার খাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয় ।
- এই পদ্ধতিতে ছাগলের মুক্তভাবে চারণভূমিতে চরে বেড়ানোর কোন সুযোগ থাকে না । তবে খামার গৃহের সাথে খামার গৃহের প্রায় দ্বিগুন জায়গা নিয়ে খোঁয়াড় তৈরী করা হয় যার চারপাশে বেড়া দেওয়া থাকে । উক্ত খোঁয়ারে ছাগলকে দিনের বেলা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার রাফেজ জাতীয় খাদ্য খোঁয়াড়ে সরবরাহ করা হয় ।

সুবিধাঃ

- পরিকল্পিতভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় করা হয় বলে উৎপাদন আশানুরূপ হয়।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজনন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় ।
- অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে তুলনামূলকভাবে জনবল খাতে ব্যয় কম হয় ।
- বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে ছাগল পালনকে শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব ।

অসুবিধাঃ

- গৃহ নির্মান ও খোঁয়াড় স্থাপনে প্রাথমিক বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে বেশী ।
- এই পদ্ধতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য পদ্ধতির চেয়ে বেশী ।
- সময়মত কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করা না গেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় । ফলে কখনো কখনো এই পদ্ধতি লাভজনক হয় না ।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় বলে খামারের কোন একটি ছাগলে সংক্রামক রোগ হলে তা দ্রুত খামারে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ।

আয়ঃ

- বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল । বিনিয়োগ যত বেশী হবে অর্থ্যাৎ যত বেশী সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশী হবে ।

৫. ইন্টেগ্রেটেড/সমন্বিত খামার

বৈশিষ্ট্যঃ

ফলজ বা বনজ বাগানে সমন্বিত উপায়ে আধা-নিবিড় বা পারিবারিকভাবে ছাগল পালন করা যেতে পারে । সাধারণতঃ পেয়ারা, পেঁপে, আম, কাঠাল, লিচু, কলা প্রভৃতি ফলজ বাগান অথবা বনজ বাগানের নিচে পারা, সিগনাল, মাসকালাই, কাউপি, ধইঞ্চা পৃভৃতি ঘাস/রাফেজ চাষ করা যেতে পারে । ফলে ঘাস চাষের জন্য আলাদা কোন জমির প্রয়োজন হয় না। উক্ত ঘাস কেটে খাওয়ানো যেতে পারে বা এতে ছাগল চরানো যেতে পারে । এ ছাড়া ফল বাগানের অতিরিক্ত পাতা কেটে ছাগলকে খাওয়ানো যেতে পারে ।

সুবিধাঃ

- সমন্বিত উপায়ে খামার গড়ে তোলা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা চারণভূমি বা ঘাস চাষের ভূমির প্রয়োজন হয় না ।
- একই ব্যক্তি একই সাথে বাগানের তদারকি ও ছাগল দেখাশোনা করতে পারেন বলে এই পদ্ধতিতে শ্রমের সাশ্রয় হয় ।
- ছাগলের মল-মূত্র জৈব সার হিসাবে খামারে ব্যবহার করা যায় ।
- এই পদ্ধতিতে ছাগর চরে বেড়ানোর সুযোগ পায় এবং অল্প জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হয় না বলে রোগ বালাইয়ের প্রকোপ কম হয় ।

অসুবিধাঃ

- নজরদারী না থাকলে ছাগল কর্তৃক বাগানের চারা গাছ, ছোট গাছ, সব্জি ক্ষেত খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে ।

আয়ঃ

- সমন্বিত উপায়ে পালন করা হয় বলে খামারীগন বাগান ও ছাগল খামার হতে তুলনামূলকভাবে বেশী আয় করতে পারেন ।

২৮.২ ঃ ছাগল খামারের স্থান নির্বাচন

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল খামারের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল খামারের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

স্বাস্থ্যসম্মত ও লাভজনক ছাগল খামার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ছাগল খামার স্থাপনের সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

- যথাসম্ভব উঁচু ও শুষ্ক জায়গায় ছাগল খামার স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যার পানি খামারে প্রবেশ করতে না পারে এবং বৃষ্টির পানি জমে না থাকে ।
- খোলামেলা এবং প্রচুর আলো বাতাস রয়েছে এমন জায়গায় খামার স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় ।
- ঘাস চাষের উপযোগী উর্বর মাটি যেমনঃ দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে খামার স্থাপন করলে ঘাস চাষের সুবিধা হয় ।

- লোকালয় হতে সামান্য দূরে কিন্তু বাজার বা শহরের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিৎ । এতে খামারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহন সহজতর হয় ।
- বিশুদ্ধ পানির উৎস/সরবরাহ রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপনা করা প্রয়োজন ।
- বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে ।
- খামারে পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় নালা নর্দমা থাকতে হবে ।
- কাছাকাছি চারণভূমি আছে এমন স্থানে খামার স্থাপন করা লাভজনক ।
- এ ছাড়া জীবন ধারণের আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল, সামাজিক অসন্তোষ নেই এমন স্থানে খামার স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় ।

২৮.৩ ঃ ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বাসস্থান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বাসস্থান সম্পর্কে ধারণা পাবেন ন ।

ছাগলের ঘর নির্মানে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মান করা দরকার ।
- ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।
- ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ ।
- ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা লম্বি দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল ।

ছাগল খামারে যে সকল ঘর থাকা প্রয়োজন ঃ

পারিবারিক পদ্ধতিতে এবং মুক্তভাবে ছাগল পালন করলে ছাগলের জন্য আলাদা ঘরের তেমন প্রয়োজন হয় না। মানুষের থাকার ঘরের একপাশে, ঘরের পাশের বারান্দায় অথবা গোয়াল ঘরের গরুর সাথে ছাগল পালন করা হয় । আধা নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে একসাথে অনেক ছাগল পালন করা হয় বলে ছাগলের জন্য আলাদা করে বিভিন্ন ঘর তৈরী করতে হয় ।
একটি বাণিজ্যিক ছাগল খামারে নিম্নবর্ণিত আলাদা আলাদা ঘর থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

- প্রজনন উপযোগী ও দুগ্ধবতী ছাগলের ঘর, ব্রুডিং পেন
- বাচ্চা ছাগলের ঘর (দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত)
- মাংস উৎপাদনকারী ছাগলের ঘর (২-৩ মাস বয়স হতে প্রাপ্ত বয়স্ক)
- পাঁঠা ছাগলের ঘর (৩ মাস বয়স হতে সার্ভিসকালীন সময়)
- গর্ভবতী ছাগলের ঘর
- আইসোলেশন শেড (অসুস্থ ছাগলের জন্য)
- কোয়ারেন্টাইন শেড (নতুন ক্রয়কৃত ছাগলের জন্য-ক্রয়ের পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত)
- দানাদার খাদ্য রাখার ঘর
- সবুজ ঘাস ও রাফেজ জাতীয় খাদ্য রাখার ঘর

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

পালন পদ্ধতি অনুসারে ছাগলের ঘরকে দুই ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. মেঝে পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে ছাগলকে মেঝেতে পালন করা হয় ।

খ. মাচা পদ্ধতির ঘর- এ ধরণের ঘরে মেঝের উপর মাচা তৈরী করে তার উপর ছাগল পালন করা হয়।

নির্মান উপকরণের উপর ভিত্তি করে মেঝে পদ্ধতির ঘর তিন রকম হতে পারে

- কাঁচা মেঝের ঘর
- অর্ধ পাকা মেঝের ঘর
- পাকা মেঝের ঘর

মডিউল - ২৯ ঃ

ছাগল পালন ব্যবস্থাপনা

২৯.১ ঃ খামারে ছাগল পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের খামারে পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন খামারে পালনের জন্য ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করতে হলে খামারে পালনের জন্য ছাগল নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে । খামারে পালনের জন্য ক্রয়কৃত/নির্বাচিত ছাগলকে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত হতে হবে । তা ছাড়া চর্মরোগ, চোখের রোগ এবং বংশগত রোগ ব্যাধি থাকা চলবে না। কোন এলাকায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বা কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল এমন এলাকা হতে ছাগল সংগ্রহ করা যাবে না । খামারে প্রতিপালনের জন্য উন্নত জাতের ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচন করতে হবে । নিম্নে উন্নত জাতের ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ।

ছাগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- নির্বাচনের সময় ছাগীর বয়স ৯-১৩ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
- মাথা লম্বা ও মধ্যম আকারের হবে । মুখ ভরাভরা হবে ।
- কুঁজ ও ঘাড় প্রায় সরল রেখায় বা সোজা থাকবে ।
- বুক মধ্যম আকৃতির ও বেশ চওড়া হবে যাতে সামনের দুই পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।
- পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া ও প্রসারণশীল হবে ।
- সামনের পা দুটি সোজা, দৃঢ় ও হাড়গুলো মজবুত হবে । পায়ের খুর সমান্তরালভাবে মাটিতে পড়বে।
- নির্বাচিত ছাগী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হবে । ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দেওয়ার এবং প্রতিবারে একাধিক বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড থাকতে হবে ।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ১০% এর নিচে থাকতে হবে ।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর দৈনিক গড়ে ৫০০ গ্রাম দুধ প্রদান করার রেকর্ড থাকতে হবে ।
- নির্বাচিত ছাগীর ওলান বড়, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা লক্ষণযোগ্য হবে।

পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
- পাঁঠা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকল প্রকার যৌন ব্যাধি মুক্ত ।
- চামড়া নরম ও ঢিলেঢালা হবে, টানলে উঠানামা করবে ।

- পশম মসৃণ ও ছোট ছোট, সিল্কের মত চকচকে হবে ।
- মাথা ও ঘাড় পুরুষালি, ভারী হবে । শরীরের পেছনের ভাগ সবল ও দৃঢ় হবে ।
- অন্ডকোষের আকার বড় ও সুগঠিত এবং দৃষ্টিযোগ্য হবে কিন্তু বেশী ঝুলানো থাকবে না ।
- পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট, মজবুত ও দৃঢ় হবে ।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর দুধ প্রদানের রেকর্ড কমপক্ষে ৭০০ গ্রাম হবে ।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হবে, বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান এবং প্রতিবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের রেকর্ড থাকতে হবে ।
- পেছনের পা দুটি মজবুত, সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে । জাম্প করায় পটু হতে হবে ।

২৯.২ ঃ ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন খামারে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস

ছাগল রোমন্থক প্রাণী । গরু মহিষের মত ছাগলও সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে । এ ছাড়া ছাগল সংকটকালে নাইট্রোজেন ও পানি অধিকতর ভালভাবে শরীরের কাজে লাগাতে পারে । প্রাকৃতি দুর্যোগ বা খাদ্যের অভাব হলে ছাগল অত্যন্ত নিম্ন পুষ্টিমানযুক্ত খাদ্য খেতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণি খায় না । এরা সাধারণ বা নিম্নমানের খাদ্য খেয়েই প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় । ছাগল সাধারণতঃ কাঁঠাল, আম, কলা, তুত, গামারী, মেহগিনি, বট, বরই, ভূট্ট, সূর্যমুখী প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে থাকে । এ ছাড়া রাস্তা ঘাটের দূর্ব ঘাস, লতা, গুল্ম, কাটা ঝোপ এবং বাড়ির শাক সব্জি ও ফলমূলের উচ্ছিষ্টাংশ ও খোসা খেয়ে ছাগল তার খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে । ছাগলকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে এবং অধিক উৎপাদন পেতে হলে একে নিয়মিত সুষম খাদ্য খাওয়ানো উচিৎ । অধিক দুধ ও মাংস এবং উন্নতমানের চামড়া উৎপাদনের জন্য ছাগলকে সম্পূরক দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয় ।

খাদ্যের সুস্বাদুতা

ছাগল অন্যান্য প্রাণীর খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে । আবার ছাগলের সামনে গাছের ডালপালা ও কান্ডসহ পাতা দিলে ছাগল কান্ড বাদে শুধু পাতা খেয়ে থাকে । ছাগল সাধারণতঃ বেছে বেছে খাদ্য মনোনীত করে খেয়ে থাকে । ছাগল মিষ্টি, তিক্ততা এবং টকা স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে । এরা তিক্ত স্বাদ বেশি সহ্য করতে পারে । ছাগল লিগুম ফডার বেশী পছন্দ করে । ছাগল শালগম, ভূট্টা, জোয়ার ইত্যাদি কাঁচা ঘাস পছন্দ করলেও সাইলেজ পছন্দ করে না । নিতান্ত বাধ্য না হলে এরা সাইলেজ খেতে চায় না ।

খাদ্যের সুষমিকরণ

বিজ্ঞানীগন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ছাগল দুধ উৎপাদনের জন্য তার ওজন অনুপাতে ৭-৮ ভাগ বেশী খায় । ৪.৫ লিটার দুধ দেয় এমন একটি ছাগলের দৈনিক গড়ে ১.৮ কেজি শুষ্ক বস্তু (ড্রাই ম্যাটার) বিশিষ্ট খাদ্য প্রয়োজন যদিও ঐ ছাগল স্বাধীনভাবে চরে দৈনিক সর্বাধিক ৩.১৮ কেজি পরিমান শুষ্ক বস্তু (ড্রাই ম্যাটার) বিশিষ্ট খাদ্য খেয়ে থাকে । ছাগলের দেহের তুলনায় পেটের স্ফিতি বড় হওয়ায় তার পেট পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । পেটের স্ফিতি পূর্ণ করার জন্য দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি ছাগলকে সেলুলোজ বা আঁশ জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন ।

খাদ্যের পুষ্টিমান

বয়স্ক ছাগলের তুলনায় ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ আমিষ ও উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে । ৪-১৫ বয়সী ছাগল (বাড়ন্তকালীন সময়) কে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশজাতীয় খাদ্য প্রদান করা প্রয়োজন । স্মরণ রাখা দরকার যে, ছাগল খামারের খাদ্য ব্যয় মোট ব্যয়ের ৬০-৭০ ভাগ । তাই খামারের লাভ লোকসান খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল । দানাদার খাদ্যের মূল্য আঁশ জাতীয় খাবারের চেয়ে বেশি । তাই আঁশ জাতীয় খাবার খেয়ে যত বেশি পুষ্টি চাহিদা মেটানো যাবে তত ব্যয় কমানো যাবে । নিম্নে ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা ছক আকারে দেখানো হলো ।

ছাগলের ওজন (কেজি)	**দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)**	**দৈনিক ঘাস সরবরাহ/চরানো (কেজি)**
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৫
> ১৮	৩৫০	২.০

টেবিল-২৯.১ঃ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছাগীর ওজন (কেজি)	দুধের পরিমান (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ঘাস/পাতা (কেজি)	খড় (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
২০	০.৫০	৩০০	১.৫	-	১.০
২৫	০.৮০	৪০০	১.৫	-	১.২
৩০	১.০০	৪০০	২.০	৩০০	১.৫
৩৫	১.০০	৪০০	২.৫	৫০০	২.০
৪০	১.০০	৪০০	২.৫	৬৫০	২.০

টেবিল ২৯-২ঃ দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউরিয়া মিশ্রিত খড় (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩	৬.০	০.৪০	০.০২	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫	০.০৫	২০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০	০.০৫	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০	০.১০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০	০.১৫	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০	০.২০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০	০.২০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০	০.২০	৩০০	৪০০
১৩	২৪.০	১.৫০	০.২০	৩০০	৪০০
১৪	২৫.৮	১.৬০	০.২০	৩০০	৪০০
১৫	২৬.৫	১.৮০	০.২০	৩০০	৪০০

টেবিল ২৯-৩ঃ বিভিন্ন ওজনের খাসীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা ছাগলের খাদ্য	বড় ছাগলের খাদ্য
ছোলা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম ভাঙ্গা	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
গমের ভূসি	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ	০৪ ভাগ	০৪ ভাগ
লবন	০১ ভাগ	০১ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

টেবিল ২৯-৪ঃ বাচ্চা ও বড় ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

২৯.৩ ঃ ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন ।

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে । ক্রমাগত বাছাই পদ্ধতিতে দলের মধ্যে উন্নত মানের পাঁঠা এবং প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে ছাগলের মান উন্নয়ন করা হয় । বাছাই ক্রিয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে ।

প্রজনন উপযোগী ছাগলের বৈশিষ্ট্য

১। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

- দৈহিক বৃদ্ধির হার
- যৌন পরিপক্কতায় আসার বয়স ও ওজন
- জন্মকালীন বাচচার ওজন
- দুধ ছাড়ার বয়স ও ওজন
- দুধ ছাড়ার পর দৈহিক বৃদ্ধির হার

২। উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- ছাগল প্রতি মাংস উৎপাদন
- ড্রেসিং আউট পার্সেন্টেজ
- চামড়ার গুনাগুন
- দুধ উৎপাদন
- লোম উৎপাদন
- লোমের গুনগত মান

৩। পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্য

- বয়োসন্ধির বয়স
- প্রথম প্রজননে আসার বয়স ও ওজন
- প্রথম গর্ভধারণের সময় বয়স ও ওজন

- প্রথম প্রসবে ওজন ও বয়স
- কিডিং ইন্টারভ্যাল
- প্রতিবার গর্ভধারণের জন্য পাল দেওয়ার সংখ্যা
- পাঁঠার শুক্রাণুর গুনগত মান

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচন

প্রজনন উপযোগী পাঁঠা নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- পাঁঠার বয়স কমপক্ষে ১২ মাস বা তার বেশি হতে হবে ।
- পাঁঠা শারীরিকভাবে সুস্থ হবে এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হবে ।
- পাঁঠা রুক্ষ, আক্রমনাত্মক ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হবে ।
- পাঁঠার পিতামাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে ।
- পাঁঠার অন্ডকোষ বড় ও সুগঠিত হবে । পেছনের পা মজবুত ও শক্তিশালী হবে ।
- অবশ্যই সকল প্রকার যৌন রোগ হতে মুক্ত থাকবে ।

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচন

প্রজনন উপযোগী ছাগী নির্বাচনের সময় নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে ঃ

- ছাগীর বয়স কমপক্ষে ৯ মাস হতে হবে । দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২ কেজি হতে হবে ।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হলে মাংসবহুল ছাগী নির্বাচন করতে হবে । দুধ উৎপাদনকারী জাতের হলে ওলান ও বাঁট বড় ও সুগঠিত হবে ।
- ছাগীর পিতামাতার অধিক উৎপাদনের রেকর্ড থাকতে হবে ।
- দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি এমন ছাগী নির্বাচন করতে হবে । ছাগী অবশ্যই শান্ত প্রকৃতির হবে।

ছাগীর ইস্ট্রাস বা গরম হওয়ার লক্ষণ

- ছাগীর আচরণে অস্থিরতা দেখা যায় ।
- খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা ছেড়ে দেয় ।
- মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে ।
- সঙ্গী অন্য ছাগলের পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে । অন্য ছাগলকে তার পিঠে উঠতে দেয় ।
- ঘন ঘন লেজ নাড়ে, যোনীদ্বার (ভালভা) লাল হয় এবং ফুলে যায় ।
- যোনীদ্বার দিয়ে জেলির মত মিউকাস জাতীয় তরল পদার্থ বের হয় ।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

- ছাগী গরম হওয়ার ৮ ঘন্টা পর এবং ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয় ।
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা যায় । সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন ।
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে ।
- একবার বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ছাগী পুনরায় গরম হয় ।
- ছাগীকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

২৯.৪ ঃ ছাগলের পরিচর্যা

২৯.৪.১ ঃ প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

উন্নতমানের ও অধিক উৎপাদনশীল বাচ্চা পেতে হলে ছাগলকে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রজনন করাতে হবে । আর প্রজননের সুফল পেতে হলে প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর বিশেষ যত্ন নিতে হবে । প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছাগীর জীবনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ লক্ষ্য করা যায় । ধাপগুলো হচ্ছেঃ ড্রাই পিরিয়ড, গর্ভকালীন সময়, প্রসবকালীন সময় এবং দুধ প্রদানকালীন সময় । উক্ত চারটি ধাপে ভিন্ন ভিন্নভাবে ছাগীর যত্ন নিতে হবে। নিচে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো ।

ড্রাই পিরিয়ড

বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পর হতে পুনরায় প্রজনন করার পূর্ব পর্যন্ত (পরবর্তী গর্ভধারণকাল পর্যন্ত) সময়কে ছাগীর ড্রাই পিরিয়ড বলে। এ সময়ে দেহ রক্ষা, পর্যাপ্ত হরমোন নিঃসরণ এবং দেহের ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ছাগীকে পর্যাপ্ত পরিমান পুষ্টিকর সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে

গর্ভকালীন সময়

সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ছাগীকে গর্ভকালীন সময়ে উপযুক্ত পরিমান উন্নতমানের খাবার এবং উপযুক্ত যত্ন নেওয়া জরুরী । এ সময়ে ছাগীকে স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি ভিটামিন ও মিনারেল সরবরাহ করতে হবে । গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহের দুই তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি ঘটে গর্ভধারণের শেষ সপ্তাহে । তাই এসময়ে আমিষের চাহিদা তিনগুন হয় । এসময়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও ছাগীর স্তনের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে উন্নত মানের খাবার দিতে হবে । বাচ্চা প্রসবের দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে ছাগীকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে । এসময় মাচার উপর বা উঁচু স্থানে ছাগীকে উঠতে না দেওয়া ভাল । দিনে ঘর সংলগ্ন খোঁয়াড় অথবা উঠানে ছায়ার মধ্যে ছাগীকে রাখতে হবে । গর্ভবতী ছাগীকে শুকনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে । রাতে মাটিতে শুকনো ও পরিস্কার খড় বা চট বিছিয়ে বিছানা তৈরী করে দিতে হবে ।

প্রসবকালীন সময়

প্রসবের পূর্বে ছাগীর ওলান এবং লেজের চারপাশের পশম পরিস্কার করতে হবে । এসময় দানাদার খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ করতে হবে । প্রসব ঘর অবশ্যই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনা এবং জীবানুমুক্ত রাখতে হবে । প্রসুতি ছাগী ও সদ্যজাত বাচ্চার জন্য মেঝেতে বিছানা/বেডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে । প্রসবের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে । অত্যন্ত শীতের মধ্যে সদ্যজাত বাচ্চাকে যেন উষ্ণ রাখা যায় সে সুযোগ থাকতে হবে ।

দুধ প্রদানকালীন সময়

প্রসবের পর ছাগীর প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে খাদ্যের পরিমান প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা আবশ্যক । গাভীর দুধের চেয়ে ছাগীর দুধে প্রোটিন ও চর্বির শতকরা পরিমান বেশি থাকে বিধায় দুগ্ধবতী ছাগীকে পর্যাপ্ত পরিমান প্রোটিন ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার প্রদান করতে হবে । দুগ্ধবতী ছাগীর হাইপোক্যালসেমিয়া প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমানে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে হবে ।

২৯.৪.২ ঃ সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চাকে মায়ের সামনে দিতে হবে যাতে ছাগী বাচ্চার শরীর চেটে পরিস্কার করতে পারে। বাচ্চার নাক শ্লেষ্মাতে আটকে থাকার কারণে দম বন্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে তাই প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীর ও নাকের শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফু দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহযোগীতা করতে হবে ।
- শীতের সময় দ্রুত বাচ্চার শরীর মুছে না দিলে শীতে বাচ্চার শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা দ্রুত হারাতে থাকে এবং বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে মারা যায় । এজন্য বাচ্চাকে উষ্ণ স্থানে অর্থ্যাৎ খড় বা চটের উপর রেখে চারদিক চট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে অথবা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- সদ্য প্রসূত ছাগল ছানাকে পরিস্কার পরিচ্ছন ও শুষ্ক জায়গা (ব্রুডিং পেন) তে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাভি ২-৩ সে.মি. রেখে বাকী অংশ কেটে দিতে হবে এবং উক্ত স্থানে টিংচার অব আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে ।
- সদ্য প্রসূত বাচ্চার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন শক্তি । নবজাত ছাগল ছানা শক্তি পায় মায়ের দুধ হতে । তাই প্রসবের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে ছাগল ছানাকে মায়ের শাল দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে । প্রয়োজনে শাল দুধ দোহন করে বোতলে খাওয়ানো যেতে পারে ।
- খেয়াল রাখতে হবে যে সকল বাচ্চা যেন সমভাবে দুধ পায় । অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চাকে নিজের হাতে ধরে মায়ের দুধ খাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে । জন্মের পর ১ম ৪-৫ দিন বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে ।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১ কেজির কম হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি এক সপ্তাহ পর্যন্ত চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে বাচ্চার শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার কমে যায় ।
- ছাগীর দুধ উৎপাদন কম কিন্তু বাচ্চার সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি কৃত্রিম উপায়ে গাভীর দুধ, বার্লি, পাউডার মিল্ক, ভাতের মাড় প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে।
- গরুর দুধ পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে ছাগল ছানাকে মিল্ক রিপ্লেসার তৈরী করে দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ননীমুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) ৭০ ভাগ; চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া ২০ ভাগ, সয়াবিন তেল ৭ ভাগ, লবন ১ ভাগ, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ১.৫ ভাগ এবং ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ভাগ থাকে । উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয়ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে ।

২৯.৪.৩ ঃ বাচ্চা ছাগলের যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বাচ্চা ছাগলের যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বাচ্চা ছাগলের যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- ছাগল ছানার ১৫ দিন বয়স হতে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্য এবং আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি) খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে ।
- যে সকল ছাগল ছানা দীর্ঘ সময় ধরে মায়ের অপর্যাপ্ত দুধ পাওয়ার কারণে দূর্বল হয় তাদেরকে অন্যান্য সুষম খাবার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ছাগল ছানার আমিষের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে এবং বাচ্চা সুস্থ ও সবল হবে ।
- শীতের সময় মেঝেতে ছালা বা খড় বিছিয়ে মার সাথে ছাগল ছানাকে রাখতে হবে ।
- প্রয়োজনে ছাগল ছানার শরীর গরম কাপড়া বা ছালা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে ।
- ছাগলের ঘরের বেড়া বা দেয়াল চট দিয়ে ঢেকে দেয়া দেতে পারে যাতে ঘর হতে শীত শীত ভাব দূর হয় ।
- প্রতিদিন খাদ্য ও পানির পাত্র পরিস্কার করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘর ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে না হয় ।
- শীতে বা বৃষ্টির সময় ছাগর ছানাকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিৎ নয় । এতে ঠান্ডা লেগে ছাগল ছানার নিউমোনিয়া হতে পারে ।
- বড় প্রাণীর আক্রমন হতে ছাগল ছানাকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- বিভিন্ন কারণে ছাগল ছানার শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন হতে পারে । এর ফলে বাচ্চা রক্তশূন্যতায় ভুগে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায় । এ সব পরজীবির আক্রমন প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানাকে উঁকুন নাশক সাবান দিয়ে অথবা ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে গোসল করাতে হবে । ছাগল ছানার বয়স ২ মাস হলেই প্রতি সপ্তাহে দুইবার একে সাধারণ পানিতে গোসল করাতে হবে । শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন দেখা দিলে মাসে দুইবার ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে বাচ্চাকে গোসল করাতে হবে । গোসলের পরপরই ছাগল ছানার শরীর কাপড় বা ছালা দিয়ে মুছে দিতে হবে ।
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছাগল ছানার পেটে গোল কৃমি, ফিতা কৃমি এবং যকৃত কৃমিসহ বিভিন্ন ধরণের কৃমি হতে থাকে । এর ফলে ছাগলের খাদ্য হজম কমে যায় এবং হজমকৃত খাদ্য শোষণে ব্যাঘাত ঘটে । এক পর্যায়ে বাচ্চা অপুষ্টিতে দূর্বল হয়ে মারা যেতে পারে । তাই বাচ্চার বয়স একমাসের অধিক হলে প্রতি চার মাস পরপর পায়খানা পরীক্ষা করে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

২৯.৪.৪ ঃ পাঁঠার যত্ন

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁঠার যত্ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন পাঁঠার যত্ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

ছাগীর তুলনায় পাঁঠার দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশী । একটি পাঁঠা মাত্র তিন মাস বয়সেই বয়োঃপ্রাপ্তি লাভ করে । কিন্তু ৬ মাস বয়সের আগে তাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে না; অন্যথায় পাঁঠার স্বাস্থ্যহানী ঘটবে । ১২ মাস বয়স প্রজনন কাজের জন্য আদর্শ । পাঁঠার প্রজনন ক্ষমতা ২-৩ বছর বয়সে সর্বোচ্চ । প্রজনন কাজে ব্যবহৃত পাঁঠাকে শারীরিক ভাবে সুস্থ ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী হতে হয় । পর্যাপ্ত পরিমানে সুষম খাদ্য সরবরাহ করলে এবং উপযুক্ত পরিচর্যা করলে একটি পাঁঠাকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যায় । একটি ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠার থাকার জন্য ২৪ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয় । পক্ষান্তরে একটি যমুনা পাড়ি পাঁঠার থাকার জন্য ৩৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয় । পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা দুধালো ছাগীর মতই । তবে প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন । কোন ভাবেই পাঁঠার শরীরে চর্বি জমতে দেয়া উচিৎ নয় । প্রয়োজনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । ২৮-৩০ কেজি ওজনের একটি পাঁঠাকে দৈনিক ৪০০ গ্রাম করে দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে । একটি পাঁঠাকে সপ্তাহে ১০-১২ বারের বেশি প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিৎ নয় ।

২৯.৫ ঃ ছাগলের বাচ্চাকে খাসী করানো

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বাচ্চাকে খাসী করানো সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বাচ্চাকে খাসী করানো সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে খামারে ছাগল পালন করা হলে প্রজনন উপযোগী কয়েকটি পাঁঠা রেখে বাকী সব পুরুষ ছাগলকে খাসী করানো হয়ে থাকে । খাসী করানো হচ্ছে কোন প্রাণীর সেক্স গ্লান্ডকে অপসারণ বা নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে উক্ত প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা রহিত করা । খাসী করানোর মাধ্যমে খামারে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা হয় । পাঁঠার শরীরে ক্যাপ্রিক এসিড ও ক্যাপ্রোয়িক এসিডের উপস্থিতির কারণে তীব্র গন্ধ বের হয় । খাসী করানো হলে উক্ত গন্ধ দূরীভূত হয় । এ ছাড়া ছাগলের মাংস গন্ধমুক্ত ও সুস্বাদু হয় । খাসীকরণের ফলে চামড়ার গুনগত মানও বৃদ্ধি পায় । এর ফলে ছাগল শান্ত ও নম্র স্বভাবের হয় এবং অনেক ছাগল একত্রে পালন সহজতর হয় । ২-৪ সপ্তাহ বয়সে পাঁঠা বাচ্চাকে খাসী করানো উত্তম ।

খাসীকরণের পদ্ধতিসমূহ

দুই পদ্ধতিতে আমাদের খাসীকরণ করা হয়ে থাকে ঃ

১. বন্ধ পদ্ধতি - বার্ডিজোস ক্যাস্ট্রেটর দ্বারা এবং রাবার রিং পরিয়ে ছাগলকে খাসী করা হয়ে থাকে । এ পদ্ধতিতে শরীর হতে সেক্স গ্লান্ড অপসারণ করা হয় না অর্থ্যাৎ সেক্স গ্লান্ড যথাস্থানেই থাকে ।
২. মুক্ত/খোলা পদ্ধতি - ধারালো ছুরি/ব্লেড/স্কালপেল এর সাহায্যে সার্জিক্যাল অপারেশনের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে শরীর হতে সেক্স গ্লান্ড অপসারণ করা হয় ।

সতর্কতা ও পরিচর্যা

সার্জিক্যাল অপারেশনে সৃষ্ট ক্ষতে যে মশা, মাছি বা পোকামাকড় না বসে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । ক্ষতস্থানে সালফানিলামাইড পাউডার লাগাতে হবে । স্যাঁতসেঁতে ও অপরিস্কার স্থানে খাসীকে রাখা যাবে না । শুকনো জায়গার ব্যবস্থ করতে হবে । প্রয়োজনে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী খাসীকে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে ।

মডিউল - ৩০ ঃ
ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

রোগ ব্যাধি ছাগল খামারের অন্যতম প্রধান ক্ষতির কারণ । লাভজনক ভাবে ছাগল পালন করতে হলে খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে । রোগের বিরূদ্ধে সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে খামারের ক্ষতি এড়ানো অসম্ভব হয়ে পরে । তাই খামারের রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ।

৩০.১ ঃ সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ এবং অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ এবং অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ এবং অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবেন ।

সুস্থ ছাগলের লক্ষণসমূহ

- ছাগলের নাক, মুখ ও চোখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে । চোখের কোনায় পিঁচুটি থাকবে না ।
- ছাগল দলবদ্ধভাবে থাকবে এবং দলের সাথে চলাফেরা করবে ।
- সারা শরীরের লোম উজ্জ্বল, মসৃণ ও চকচকে থাকবে ।
- মাথা সবসময় উঁচু করে চলবে । নাকের আগায় ঘাম থাকবে ।
- কান সজাগ ও খাঁড়া থাকবে এবং লেজ স্বাভাবিকভাবে নেড়ে মশা মাছি তাড়াবে ।
- ছাগলের ক্ষুধা থাকবে এবং সর্বদাই কিছু না কিছু খেতে আগ্রহ প্রকাশ করবে ।
- জাবর কাটবে ।
- পানির পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে ।
- মল-মূত্র স্বাভাকি রংয়ের এবং নিয়মিত হবে ।
- পায়ু অঞ্চল থাকবে পরিচ্ছন্ন ।
- শান্ত থাকবে এবং অপরিচিত কোন কিছুর সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করবে না ।

অসুস্থ ছাগল চেনার পদ্ধতি

- ছাগলের মুখ ও চোখ নিস্তেজ ও বিষন্ন হবে । চোখের কোনায় পিঁচুটি থাকতে পারে ।
- ছাগল দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলাফেরা করবে অথবা চুপ করে দাড়িয়ে থাকবে ।
- মাথা নীচু বা ঝুলে থাকবে । জ্বর থাকলে । নাকের আগা শুকনো ও গরম থাকবে ।
- ছাগলের ক্ষুধা কম থাকবে এবং খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করবে ।
- বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণ থাকবে যেমন, পিপিআর হলে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা, ধনুষ্টংকার হলে শরীর শক্ত হয়ে যাবে এবং নড়াচড়া করবে না, একথাইমা হলে ঘা দেখা যাবে, ক্ষুরারোগ হলে মুখে, জিহবায় ও পায়ের ক্ষুরে ক্ষতস্থান দেখা যাবে ইত্যাদি ।
- মল-মূত্র অনিয়মিত এবং স্বাভাবিক হবে না ।
- তীব্র/অতি তীব্র রোগে অস্থিরতা প্রকাশ করবে ।

৩০.২ ঃ ছাগলের অপুষ্টিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের অপুষ্টিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে ছাগলের অপুষ্টিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পরিমানমত না থাকলে উক্ত খাদ্য খেয়ে ছাগল অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধিতে ভুগে থাকে । কিছু কিছু পুষ্টি উপাদা দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমানে প্রয়োজন হয় যেমনঃ শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য । আবার কিছু কিছু উপাদান খুব সামান্য পরিমানে প্রয়োজন হয় । যেমন মিনারেল ও ভিটামিন । এদের প্রয়োজন খুব সামান্য পরিমানে হলেও এর অভাবে ব্যাপক ক্ষতি হয় । তাই অপুষ্টি জনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সাধারন জ্ঞান থাকা আবশ্যক । নিম্নে কয়েকটি অপুষ্টি জনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ।

অস্টিওম্যালাসিয়া ঃ

শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাব হলে, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হলে বা খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত ঠিক না থাকলে অস্টিওম্যালাসিয়া রোগ হয় । এ রোগে ছাগলের ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, পায়ের গিঁড়া ও জয়েন্ট ফুলে যায়, দুধ উৎপাদন কমে যায় এবং ক্রনিক অবস্থায় ছাগল চলাফেরা করতে এমনকি দাড়াতে অক্ষম হয়ে পড়ে । অস্টিওম্যালাসিয়া রোগে আক্রান্ত পাঁঠাকে প্রজনন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যায় না ।

অপুষ্টি জনিত রক্তশূন্যতা ঃ

শরীরে আয়রনের অভাব হলে রক্তশূন্যতা দেখা যায় । এ ছাড়া কপার, কোবাল্ট ও ভিটামিন-বি এর অভাব হলেও রক্তশূন্যতা হয়ে থাকে । পরজীবির আক্রমনেও ছাগলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে । এ রোগে ছাগল ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে যায় এমনকি মৃত্যুবরণ করতে পারে । সুষম খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে রক্তশূন্যতা এড়ানো সম্ভব ।

গয়টার বা গলগন্ড ঃ

শরীর আয়োডিনের অভাব হলে এ রোগ দেখা যায় । এ রোগে গলা ফুলে যায়, প্রজনন অক্ষমতা দেখা দেয় এবং দূর্বল বাচ্চা জন্ম হয় । ছাগলের খাদ্যে আয়োডিনযুক্ত লবন যোগ করে ছাগলকে খাওয়ালে ছাড়া কপার, কোবাল্ট ও ভিটামিন-বি এর অভাব হলেও রক্তশূন্যতা হয়ে থাকে । পরজীবির আক্রমনেও ছাগলে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে । এ রোগে ছাগল ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ক্ষুধামন্দা দেখা যায়, পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে যায় এমনকি মৃত্যুবরণ করতে পারে । সুষম খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে রক্তশূন্যতা এড়ানো সম্ভব ।

৩০.৩ ঃ ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

পরজীবিজনিত রোগে ছাগলের পুষ্টির অভাব ঘটে । ফলে উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয় । একটি ছাগল খামার সফলভাবে পরিচালনা করতে হলে ছাগলকে অবশ্যই অন্তঃ পরজীবি ও বহিঃ পরজীবির আক্রমন হতে মুক্ত রাখতে হবে । নিম্নে ছাগলের কয়েকটি অন্তঃ পরজীবি ও বহিঃ পরজীবিজনিত রোগব্যাধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ।

অন্তঃ পরজীবি বা কৃমিজনিত রোগ ঃ

ছাগলের অন্তঃপরজীবিজনিত রোগ প্রধানতঃ ফ্যাসিওলা, প্যারামফিস্টোমাম, অ্যাসকারিয়া, হেমোনকাস, হুক ওয়ার্ম, সিস্টোসোমা, ইসোফেগোসটোমাম, ট্রাইচুরিয়া, ট্রাইকোস্টংগাইলাস প্রভৃতি প্রজাতির কৃমি দ্বারা ঘটে থাকে । এসব কৃমির আক্রমনে শরীরে পুষ্টির অভাব ঘটে, রক্তশূন্যতা দেখা যায়, ওজন কমে যায়, ক্ষুধামন্দা ঘটে, আক্রান্ত অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে ছাগলের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে । ছাগলের বয়স একমাসের অধিক হলে প্রতি চার মাস পরপর পায়খানা পরীক্ষা করে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

বহিঃ পরজীবিজনিত রোগ ঃ

উঁকুন, আঠালী, মাইট, মাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গ ছাগলের বহিঃপরজীবিজনিত রোগের প্রধান কারণ । মাইটের আক্রমনে ছাগলের সারকোপটিক মেঞ্জ, ডেমোডেকটিক মেঞ্জ, সোরোপটিক মেঞ্জ ও কোরিওপটিক মেঞ্জ খোস পাঁচড়া রোগ হয়ে থাকে । এ রোগে ছাগলের দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন যেমন বাধাগ্রস্থ হয় তেমনি এর চামড়ার গুনগত মান কমে যায় । ইস্ট্রাস ওভিস প্রজাতির মাছির লার্ভার আক্রমনে ছাগলের নেজাল মিয়াসিস রোগ হয় এ রোগে ছাগলের নাক চুলকায়, হাঁচি হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস পায়, ছাগল দূর্বল হয়ে পড়ে এমনকি মারাও যায় । উঁকুন ও আঠালী ছাগলের শরীর হতে রক্ত চুষে খায় । এদের অতিরিক্ত আক্রমনে ছাগল অস্থির হয়ে পড়ে, খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখায়, রক্ত শূন্যতায় ভুগে । বহিপরজীবিজনিত রোগ হতে ছাগলকে রক্ষার জন্য একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

৩০.৪ ঃ ছাগলের বিপাকীয় রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের বিপাকীয় রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের বিপাকীয় রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

কিটোসিস ঃ

ছাগলের গর্ভধারণের শেষ দিকে সাধারণতঃ বাচ্চা প্রসবের কয়েকদিন পূর্ব থেকে প্রসবের পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ হয়ে থাকে । রক্তে গ্লুকোজের পরিমান কম হলে, রক্তে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমান বেড়ে গেল, খাদ্য গ্রহণের মাত্রা কমে গেলে, শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাকে সমস্যা হলে ছাগলের রক্তের মধ্যে এসিটোন ও কিটোন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমে যায় । ফলে বিষক্রিয়া হয় । এজন্য এ রোগকে কিটোনেমিয়া ও প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া নামেও অভিহিত করা হয় । এ রোগে ছাগলের ক্ষুধামন্দা হয়, জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়, আক্রান্ত ছাগীর শ্বাস প্রশ্বাসে এসিটোনের গন্ধ পাওয়া যায়, অস্থিরতা দেখা দেয়, মাংসে খিঁচুনি শুরু হয়, হাটা চলায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, ঠোঁট কাঁপে, চোখ ঘুরায়, অনেক সময় ছাগল অন্ধ হয়ে যায়। অতি তীব্র রোগে শুয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

দুগ্ধজ্বর/মিল্ক ফিভার ঃ

বাচ্চা প্রসবের কিছুদিন পূর্ব হতে কিছুদিন পর পর্যন্ত সময়ে ক্যালসিয়ামের অভাবে ছাগীতে এ রোগ দেখা যায়। এ রোগে ছাগীর পক্ষাঘাতের মত অবস্থা হয়, ছাগী ঘাড় ঘুরিয়ে অবশ হয়ে শুয়ে পড়ে, অজ্ঞান ও প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় । চিকিৎসা না করালে ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে ছাগল মারা যায় । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্তছাগলকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

গ্রাস টিটানি ঃ

খাদ্যে ম্যাগনেসিয়ামের অভাব থাকলের ছাগলের এ রোগ হয় । এ রোগকে হাইপোম্যাগনেসেমিয়াও বলা হয়। এ রোগে ছাগল এলোমেলোভাবে পা ফেলে, মাংসপেশীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, খিঁচুনি দেখা দেয়

এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অচল হয়ে যায় । বেশী আক্রান্ত হলে লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই ছাগল মারা যায় । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করতে হবে ।

৩০.৫ ঃ ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগলের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

৩০.৫.১ ঃ ওলান প্রদাহ/ম্যাস্টাইটিস

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ফাংগাস সহ ১৮-২০ ধরণের জীবানু দ্বারা দুগ্ধবতী ছাগলের ম্যাস্টাইটিস বা ওলান প্রদাহ রোগ হয়ে থাকে । এ রোগে ছাগীর ওলান লাল হয়ে ফুলে যায়, শক্ত হয়ে যায়, হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়, দুধ দোহন করলে পাত্রে দুধের তলানি পড়ে, দুধ উৎপাদন কমে যায়, দুধের স্বাদ লবনাক্ত হতে পারে, তীব্র প্রকৃতির রোগে ওলানের ভিতর পুঁজ হয় । পরে দুধের সাথে রক্ত আসে ও দুর্গন্ধ হয় । ওলান ও বাটে ব্যাথা হয় দুধ দোহন করতে বা বাচ্চাকে টেনে খেতে দিতে চায় না । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- মাঝে মাঝে ওলানের প্রত্যেক কোয়ার্টারের দুধ কালো কাপড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন তলানি, পুঁজ বা রক্ত আছে কিনা, দুধের রং পরিবর্তন হয়েছে কিনা ।
- ছাগীকে গাদাগাদি বা ঠাসাঠাসি করে রাখা যাবে না । প্রসবের আগে ও পরে ছাগীকে সমতল ও নরম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে ।
- দুধ দোহনের সময় হাত পরিস্কার করে নিতে হবে । প্রয়োজনে সাবান বা ক্লোরিন সলিউশন ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- বড় ছাগল ছানাকে ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে দেওয়া যাবে না ।

৩০.৫.২ ঃ ধনুষ্টংকার/টিটেনাস

যে কোন অপারেশন, খাসীকরণ, বাচ্চা প্রসবের সময় ছাগীতে বা ছাগল ছানার নাভীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে উক্ত ক্ষতে যদি ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি নাম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন ঘটে তখন টিটেনাস রোগ হয় । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের চোয়াল, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায় । দাঁতের মাড়ির মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দাঁত লেগে যায় বলে ছাগল খেতে পারে না । খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ থেকে লালা ঝরে, প্রথম দিকে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং শেষ দিকে তাপমাত্রা কমে যায়, দেহ শক্ত হয়ে বেঁকে যায়, পা ও ঘাঁড় শক্ত হয়ে যায় বলে আক্রান্তছাগল চলাফেরা করতে পারেনা এমনকি দাঁড়াতেও পারেনা । তীব্র আক্রান্তছাগল কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায় ।
একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী টিটেনাস আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- খোঁজাকরণ, নাড়ি কর্তন, লোম কাটাসহ যে কোন ধরণের অপারেশনের সময় ছাগলকে Anti tetanus serum/Tetanus Toxoid ইনজেকশন করতে হবে ।
- ডেটল, সেভলন প্রভৃতি এন্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।
- এক বছর পরপর দুইবার ছাগীকে Tetanus Toxoid ইনজেকশন প্রদান করলে এ রোগের আশংকা অনেক কমে যাবে ।

৩০.৫.৩ ঃ তড়কা/এ্যানথ্রাক্স

ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস নাম এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয় । এ রোগে আক্রান্ত ছাগল লক্ষণ প্রকাশের আগেই অনেক সময় মারা যায় । ছাগল টলতে টলতে পড়ে গিয়ে হাঁপাতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায় এবং মারা যায় । শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৩-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট), খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়, জাবর কাটে না, শ্বাস কষ্ট হয়, নাক মুখ দিয়ে লালা পড়ে, পেট ফুলে ওঠে, রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয় । রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মল কালো হতে হতে আলকাতরার মত হয়ে যায় । মরা ছাগলের নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত মিশ্রিত ফেনা বের হয় ।

তড়কা একটি মারাত্মক ব্যাধি । রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী তড়কা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

- মৃত ছাগলকে মাটিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গর্তে চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তার উপর মৃতদেহ রেখে মৃতদেহের উপর আবার চুন বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে ।
- কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না । কারণ চামড়া এ রোগের জীবানু বহন করে ।
- আক্রান্ত প্রাণি বা মৃতদেহ কোন অবস্থাতেই ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না ।
- মৃত ছাগলের ব্যবহৃত সকল জিনিস পুড়ে ফেলতে হবে ।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত প্রাণিকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে ।
- অসুস্থ ছাগলকে বিক্রি করা যাবে না । অসুস্থ ছাগলকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করানো যাবে না ।
- সুস্থ ছাগলকে নিয়মিত (১ বছর পর পর) এ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে ।

৩০.৫.৪ ঃ এন্টারোটক্সিমিয়া

ক্লোস্ট্রিডিয়াম প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট টক্সিন দ্বারা এন্টারোটক্সিমিয়া রোগ দেখা দেয় । পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যবস্তু এ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে । এ রোগে আক্রান্ত ছাগল শরীরের ভার বহন করতে পারে না, চারণভূমিতে হাটতে হাটতে কাঁপতে থাকে, খিঁচুনি দেখা যায়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে. পেট ফুলে উঠে, ডায়রিয়া হয় । তীব্র প্রকৃতির রোগে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে মারা যায় । রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টারোটক্সিমিয়া আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগলকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে এবং বিশুদ্ধ খাবার ও পানি প্রদান করতে হবে ।

৩০.৫.৫ ঃ ক্ষুরারোগ

ক্ষুরারোগ ছাগলের একটি ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ । এ রোগে মৃত্যুর হার কম হলেও উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয় । এ রোগে আক্রান্ত ছাগীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, গর্ভবতী ছাগীর গর্ভপাত হয়, শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখের ভিতরের পর্দায়, জিহবায়, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের ফাঁকে এমনকি ওলানে ফোস্কা পড়ে । মুখ ঘায়ের কারণে ছাগল খেতে পারে না, ফলে দূর্বল হয়ে পড়ে । ক্ষুরে ঘা হওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটে । আক্রান্ত ক্ষতে মাছি ডিম পাড়লে পোকা হতে পারে । বাচ্চা ছাগলে এ রোগ হলে হার্ট আক্রান্ত হয়ে মারা যায় ।

এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী আক্রান্ত ছাগলকে পৃথক করে সাপোর্টিভ চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । কুসুম গরম পানিতে ফিটকিরি বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে মুখের ও পায়ের ঘা ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে । ছাগলের ঘর ২% আয়োসান বা অন্যান্য ডিসইনফেকট্যান্ট দ্বারা পরিস্কার করতে হবে । রোগাক্রান্ত ছাগলের মল মূত্র, বিছানা ও ব্যবহৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে । মৃত ছাগলকে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে । কোন অবস্থাতেই মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়ানো যাবে না এবং পথে ঘাটে ফেলা যাবে না । অসুস্থ ছাগলকে স্থানান্তর করা যাবে না এবং বাজারে বিক্রি করা যাবে না ।

৩০.৫.৬ ঃ পিপিআর

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক রোগ । এ রোগের জীবানু ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় । দ্রুত চিকিৎসা না করালে ছাগল মারা যেতে পারে । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, নাক দিয়ে শ্লেস্মা ঝরে এবং নাকের ভিতরে শ্লেস্মা জমে যায়, পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া দেখা দেয়, জিহবা, দাঁতের মাড়ি, মাজল ও মুখের ভিতর ঘা হয়, মলের রং গাঢ় বাদামী হয় এবং মলের সাথে মাঝে মাঝে রক্ত মিশানো মিউকাস আসে । শ্বাস কষ্ট, কাশি প্রভৃতি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায় । চিকিৎসায় বিলম্ব হলে ৫-১০ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায় । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী পিপিআর আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন । বাচ্চার ৪ মাস বয়সে টিকা প্রদান করতে হয় । অনেক সময় ঝুঁকি এড়াতে বাচ্চার ২ মাস বয়সে টিকা দেওয়া হলে পুনরায় ৪ মাস বয়সে বুষ্টার ডোজ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । এশবার টিকা দিলে ১ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে ।

৩০.৫.৩ ঃ একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ

কন্টাজিয়াস একথাইমা হচ্ছে ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের নাক ও মুখের চারদিকে ফুসকুড়ি হয় । ঠোঁট ও মাড়িতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় । ক্ষতের উপর মরা চামড়ার আবরণ থাকে যা সরিয়ে দিলে লাল ক্ষত দেখা যায় । ক্ষতের জন্য ঠোঁট ফুলে যায় । অনেক সময় চোখ, ওলান, মলদ্বার ও পায়ের খুরের উপরের চামড়ায় ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে । ফোস্কা ফেটে তরল আঠাল পদার্থ ঝরতে থাকে এবং প্রদাহ হয় । অনেক সময় এই ক্ষত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়ে রোগ জটিল আকার ধারণ করে । একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কন্টাজিয়াস একথাইমা আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । আক্রান্ত ক্ষত ফিটকিরি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে । আক্রান্ত স্থানে মিথাইল ব্লু বা ক্রিষ্টাল ভায়োলেট ব্যবহার করা যেতে পারে । এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানার ১-২ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ১০-১৪ দিন বয়সে ২য় ডোজ এবং ৩ মাস পর ৩য় ডোজ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা প্রয়োজন ।

৩০.৫.৩ ঃ গোটপক্স

গোট হচ্ছে ছাগলের একটি অন্যতম মারাত্মক ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ । এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের জ্বর হয় । চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়ে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে । আক্রান্ত ছাগলের সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে । সাধারণতঃ মুখের চারপাশে, নাকে, মাজলে, মুখের ভিতরে দাঁতের মাড়িতে, কানে, গলায়, ওলানে ও বাঁটে পশম কম এমন জায়গায় বসন্তের গুটি বা ফোস্কা দেখা যায় । বসন্ত রোগ দেখা দিলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী বসন্ত আক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে । আক্রান্ত ক্ষতে এন্টিবায়োটিক পাউডার বা কর্টিসোন ক্রিম লাগানো যেতে পারে । রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ ছাগলকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে । সুস্থ ছাগলকে গোট পক্স টিকা প্রদান করতে হবে ।

৩০.৬ ঃ ভ্যাক্সিনেশন/টিকাদান

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের ভ্যাক্সিনেশন/ টিকাদান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান ।
অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভ্যাক্সিনেশন/ টিকাদান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন ।

রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম । রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে ভ্যাক্সিন বা প্রতিষেধক টিকা । কোন সুস্থ প্রানীকে রোগ হওয়ার পূর্বেই একটি নির্দিষ্ট রোগের টিকা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত রোগ হতে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনেশন বলে । এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড়ে ওঠে । এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনও কয়েক মাসের জন্য গড়ে ওঠে, আবার কখনও কয়েক বছর হতে আজীবনকাল হতে পারে ।

ভ্যাক্সিনেশনের সাধারণ নিয়মাবলী

- সুস্থ সবল প্রাণীকে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে । অসুস্থ প্রাণীকে ভ্যাক্সিন প্রদান করা নিরাপদ নয় ।
- পরজীবি আক্রান্ত প্রাণীতে ভ্যাক্সিন ভাল কাজ করে না । তাই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পূর্বে প্রাণীকে পরজীবি মুক্ত করে নিতে হবে ।
- সরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ভাল কোম্পানী হতে ভ্যাক্সিন সংগ্রহ করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে । মেয়াদোত্তীর্ণ ভ্যাক্সিন কোন কাজে আসে না বরং তা ক্ষতিকর।
- ভ্যাক্সিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার বা পাতিত পানি ব্যবহার করতে হবে । পুকুর, নদীনালা, ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করলে ভ্যাক্সিনের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
- পানিতে গুলানো ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে (গুলানোর সর্বোচ্চ ১ ঘন্টার মধ্যে ভ্যাক্সিন ব্যবহার করতে হবে) ।
- ভ্যাক্সিন নির্দেশনানুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে । পরিবহনের সময় থার্মোফ্লাক্সে পরিবহন করতে হবে ।
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশনামতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে ।

ভ্যাক্সিন প্রয়োগ পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরণের ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকারকের নির্দেশনানুযায়ী শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হয় । সাধারণতঃ যে সকল পদ্ধতিতে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হলো ঃ

- মাংসপেশীতে ইনজেকশন
- চামড়ার নিচে ইনজেকশন
- শিরায় ইনজেকশন
- খাদ্য বা পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ
- স্প্রে বা এ্যারোসলের মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে
- চোখে ড্রপ
- মুখে খাওয়ানো ইত্যাদি ।

ভ্যাক্সিনের কার্যকারীতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার কারণ

- ভ্যাক্সিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে
- অসুস্থ প্রানীকে ভ্যাক্সিন প্রদান করলে
- প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে কিংবা রক্তশুন্যতায় ভুগছে এমন প্রাণীতে ভ্যাক্সিন করলে
- জীবিত জীবানু দ্বারা তৈরী ভ্যাক্সিনের জীবানুগুলো মারা গেলে
- ভ্যাক্সিন গুলানোর জন্য ডিস্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার না করে অনিরাপদ পানি ব্যবহার করলে
- ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করার যন্ত্রপাতি পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত না হলে
- যে জীবানুর বিরূদ্ধে ভ্যাক্সিন দেওয়া হলো ভ্যাক্সিন ঐ জীবানুর এন্টিজেন দ্বারা তৈরী না হলে
- প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত মাত্রায় ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা না হলে

ভ্যাক্সিনেশনের সতর্কতা

- অসুস্থ প্রাণীকে কোন অবস্থাতেই ভ্যাক্সিন প্রদান করা যাবে না
- প্রয়োগের পূর্বে প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা ভালমত পড়ে নিতে হবে । নির্দেশনানুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় নির্দেশিত স্থানে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে হবে
- দুটি ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মধ্যবর্তী বিরতিকাল কমপক্ষে ২ সপ্তাহ হবে
- গর্ভবতী ছাগলকে জিটিভি দেয়া যাবে না

৩০.৭ ঃ ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকার বিবরণঃ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে ছাগলের রোগ প্রতিরোধে কতিপয় আবশ্যকীয় টিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমান
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস		চামড়ার নিচে	২ মি.লি.
গোট পক্স টিকা	৫ মাস		চামড়ার নিচে	
জলাতংক টিকা (রেবিসিন)	৪ মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া না হলে) ৯ মাস মাস (বাচ্চার মাকে টিকা দেওয়া হলে)	১ বছর পর	চামড়ার নিচে বা মাংসপেশীতে	১ মি.লি
এ্যানথ্রাক্স টিকা			চামড়ার নিচে	১ মি.লি
গলাফুলা টিকা			চামড়ার নিচে	
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে	-	মাংসপেশীতে	১ মি.লি.
ব্রুসেলোসিস টিকা			চামড়ার নিচে	
এন্টারো টক্সিমিয়া টিকা	৬ মাস		চামড়ার নিচে	
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন (১ম ডোজ), ১০-১৪ দিন (২য় ডোজ)	৩ মাস (৩য় ডোজ), ১২ মাস (পরবর্তী ডোজ)		

টেবিল ৩০-১ঃ ছাগলের বিভিন্ন টিকার বিবরণ

মডিউল - ৩১ ঃ
বিশেষ পদ্ধতিতে ছাগল পালন

৩১.১ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন [১] ঃ

উদ্দেশ্য ঃ প্রশিক্ষণার্থীদের সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।

অর্জন ঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

৩১.১.১ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সুবিধা ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে খামারে ২০ বা ততোধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয় । খামারীর বিনিয়োগ ও ইচ্ছার উপর এই সংখ্যা নির্ভরশীল । এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশে খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় । ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাচা ঘাস সরবরাহ করা হয় ।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগল পালনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ।
২. এই পদ্ধতিতে ছাগলকে উপযুক্ত বাসস্থান ও উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করা হয়
৩. খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয় ।
৪. এই পদ্ধতিতে প্রজনন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পিত ব্রিডিং করা হয়
৫. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয়
৬. বিনিয়োগের উপর আয় নির্ভরশীল । বিনিয়োগ যত বেশী হবে অর্থ্যাৎ যত বেশী সংখ্যায় ছাগল পালন করা হবে আয়ও সেই অনুপাতে বেশী হবে ।

৩১.১.২ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘরের স্থান নির্বাচন ঃ

লাভজনকভাবে খামার করতে হলে ছাগলের জন্য পরিস্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ূ চলাচলকারী পরিবেশ রয়েছে এমন আবাসন প্রয়োজন । অপরিস্কার স্যাঁতসেঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের বিভিন্ন রোগ বালাই হতে পারে । ফলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার, দুধ প্রদানের পরিমান এবং বাচ্চা উৎপাদনের হার কমে যায় ।

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘরের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- ছাগলের বাসগৃহ শুষ্ক ও উঁচু স্থানে নির্মান করা দরকার ।
- ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।
- ঘরের মেঝে সব সময় শুষ্ক ও পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ ।
- উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- ছাগলের ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বা লম্বি দক্ষিণ দিক খোলা থাকলে ভাল ।
- খামারের তিনদিকে ঘেরা পরিবেশ বিশেষ করে উত্তর দিকে গাছপালা লাগাতে হবে ।

৩১.১.৩ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের বাসঘর নির্মান ঃ

আয়তন

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে সাধারণতঃ ১৪-১৬ ঘন্টা সময় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয় । এজন্য এই পদ্ধতিতে একটি ছাগলের জন্য ৮-৯ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয় । অর্থ্যাৎ ১৬ x ১২ বর্গফুট ঘরে ২৪ টি বয়স্ক ছাগল রাখা যায় । প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫-৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয় ।

বাসঘরের ধরণ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিনা বা ইটের তৈরী হতে পারে। ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরী করে তার উপর ছাগলকে রাখতে হবে । মাচার উচ্চতা ৫ ফুট হবে এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা হবে ৬-৮ ফুট । গোবর ও পেশাব পড়ার সুবিধার্থে মাচার মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে । শীতের সময় মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে ।

বাসঘরের বিন্যাস

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখা উচিৎ । পাঠাকে সবসময় ছাগী হতে পৃথক রাখা উচিৎ। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুস্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে । ছাগল ছানাকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত মা ছাগীর সাথে রাখা উচিৎ । বাড়ন্ত ছাগল ও খাসীকে একসাথে রাখা যেতে পারে তবে তাদেরকে পৃথকভাবে খাওয়াতে হবে ।

ব্রুডিং পেন

বাঁশের খাঁচা বা কাঠের খাঁচাকে ব্রুডিং পেন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এর চারপাশ ছালা বা চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকবে । খাঁচার মেঝেতে ৪-৫ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকবে । ৬০ x ৫৬ x ৬০ ঘন সে.মি. আয়তনের ব্রডিং পেনে ২ টি ছাগীসহ ৪-৬ টি বাচ্চা রাখা যায় । তাপমাত্র ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামলে খাঁচা প্রতি ১ টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায় ।

৩১.১.৪ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্যের পরিমান ও গুনগত মান নির্ভর কওে চারণ ভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমান ও গুনগত মানের উপর । বয়স ও উৎপাদনের ভিত্তিতে এ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ ঃ

ক) ছাগল ছানার কলষ্ট্রাম ও দুধ খাওয়ানো ঃ

সাধারণতঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন জন্মের সময়ে ০.৮-১.৫ কেজি হয় । জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে কলষ্ট্রাম বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে । শাল দুধ বাচ্চার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে । প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগল ছানাকে ১৫০-২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হবে । এই পরিমান দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে । শাল দুধ খাওয়াতে দেরী হলে হজমে সমস্যা হয় । দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে । ছাগল ছানা সাধারণতঃ ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় । জন্ম হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত হারে খাদ্য প্রদান করা উচিৎঃ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমান	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমান	কাচা ঘাস
০-২	২০০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৩-৪	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৫-৬	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমান
৭-৮	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৯-১০	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
১১-১২	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

টেবিল-৩১.১ ঃ ছাগল ছানার বয়স ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে । কিন্তু ছাগীর দুধের বাট দুটি হওয়ায় সবগুলো বাচ্চা একসাথে মায়ের দুধ খেতে পায় না । ফলে অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চা আরও দূর্বল হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে ছাগল ছানাকে নিম্নোক্ত মিশ্রণ অনুযায়ী মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো যেতে পারে ।

উপাদান	**পরিমান (%)**
ননীমুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) পাউডার	৭০
চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া	২০
সয়াবিন তেল	৭
লবন	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

টেবিল-৩১.২ঃ মিল্ক রিপ্লেসারের বিভিন্ন উপাদান

উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয় ভাগ উষ্ণ (৩৯-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে ।

খ) কিড ষ্টার্টার ঃ

ছাগল ছানার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন এবং উচ্চ বিপাকীয় শক্তি থাকতে হবে । নিম্নে ছাগল ছানার কিড ষ্টার্টার এর কয়েকটি সম্ভাব্য মিশ্রণ দেয়া হলো ঃ

উপাদান	**মিশ্রণ-১**	**মিশ্রণ-১**	**মিশ্রণ-১**
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
মাসকালাই/খেসারী ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
গমের ভূষি/চালের কুড়া	২৫.০	২৫.০	২৫.০
তিলের খৈল	১০.০	৫.০	-
সয়াবিন খৈল	৮.০	১০.০	১৭.০
শুটকি মাছর গুড়া	-	২.০	-
চিটাগুড়	৪.০	৫.০	৫.০
সয়াবিন তেল	১.০	১.০	১.০
লবন	১.০	১.০	১.০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫

টেবিল-৩১.৩ ঃ কিড (০-৩ মাস) ষ্টার্টারের সম্ভাব্য মিশ্রণ (%)

গ) সবুজ ঘাস ঃ
ছাগল ছানার **১৫** দিন বয়স হতে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্য এবং আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি) খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে । মোটামুটি একমাসের মধ্যে পাকস্থলী ও অন্ত্রের জীবানুর মাধ্যমে ছাগল ছানা ঘাস হজম করতে পারে । এ সময়ে ছাগল ছানাকে কচি ঘাস ও পাতা খাওয়ানো যেতে পারে । ছাগল ছানা এ সময় ২০০-৩০০ গ্রাম ঘাস/পাতা খেতে পারে ।

ঘ) বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ
ছাগলের বাড়ন্তকালীন সময়ে যে সব ছাগল প্রজনন বা মংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে । দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে । ছাগল সাধারণতঃ তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে । **টেবিল-২৯.১ এ** বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা দেওয়া হয়েছে । দানাদার খাদ্যের পরিমান সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতা এবং গুনগত মানের উপর নির্ভরশীল ।

৩১.১.৫ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগল ও দুধালো ছাগীর মতই । তবে প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন । কোন ভাবেই পাঁঠার শরীরে চর্বি জমতে দেয়া উচিৎ নয় । প্রয়োজনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে । ২৮-৩০ কেজি ওজনের একটি পাঁঠাকে দৈনিক ৪০০ গ্রাম করে দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে ।

৩১.১.৬ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে ছাগীকে গর্ভকালীন সময়ে উপযুক্ত পরিমান উন্নতমানের খাবার এবং উপযুক্ত যত্ন নেওয়া জরুরী । এ সময়ে ছাগীকে স্বাভাবিক খাদ্যের পাশাপাশি ভিটামিন ও মিনারেল সরবরাহ করতে হবে। গর্ভস্থ ভ্রূণের দেহের দুই তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি ঘটে গর্ভধারণের শেষ সপ্তাহে । তাই এসময়ে আমিষের চাহিদা তিনগুন হয় । এসময়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও ছাগীর স্তনের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে উন্নত মানের খাবার দিতে হবে ।

প্রসবের পর ছাগীর প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে খাদ্যের পরিমান প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা আবশ্যক । গাভীর দুধের চেয়ে ছাগীর দুধে প্রোটিন ও চর্বির শতকরা পরিমান বেশি থাকে বিধায় দুগ্ধবতী ছাগীকে পর্যাপ্ত পরিমান প্রোটিন ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার প্রদান করতে হবে । দুগ্ধবতী ছাগীর হাইপোক্যালসেমিয়া প্রতিরোধ করার জন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমানে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে হবে । দুগ্ধবতী ছাগীর দৈনিক খাদ্য সরবরাহের তালিকা **টেবিল ২৯-২ এ দেখানো হয়েছে ।**

৩১.১.৭ ঃ সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের মাঠে চরানো ঃ

সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘরে দানাদার খাদ্য প্রদানের সাথে সাথে মাঠে চরিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমানে ঘাস খাওয়ানো উচিৎ । ভাল চারণ ভূমিতে প্রতি হেক্টরে ৮০-১০০ টি ছাগল চরানো যায় । চারণ ভূমিতে দুর্বা, রোজী, পেঙ্গোলা প্রভৃতি জাতের ঘাস লাগানো যেতে পারে । এ ছাড়া অতিরিক্ত ঘাস সরবরাহের জন্য আলাদাভাবে নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা ইত্যাদি ঘাসের চাষ করা যেতে পারে । এ ছাড়া বর্ষাকালে ঘাসের সাথে মাসকালাই ছিটিয়ে দিলে ঘাসের খাদ্যমান অনেক বেড়ে যায় । শীতকালে পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না বিধায় ছাগলকে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) খাওয়ানো যেতে পারে ।

ইউএমএস তৈরীর প্রণালীঃ

উপকরণ-

১।	২-৩ ইঞ্চি করে কাটা খড়	-	১০ কেজি,
২।	পানি	-	৬ লিটার
৩।	চিটাগুড়	-	২.২ কেজি
৪।	ইউরিয়া	-	৩০০ গ্রাম

প্রথমে পানি, চিটাগুড় ও ইউরিয়া মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ খড়ের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । ইউরিয়া চিটাগুড় মিশানো খড় প্রতিদিন ছাগল প্রতি ০.৫-১.০ কেজি দিতে হবে । তবে এভাবে খড় খাওয়ানোর জন্য ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্থ করে নিতে হবে ।

৩১.২ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন [২] ঃ

ছাগলকে মাঠে না ছেড়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থপানা অনুসারে ছাগল পালনের প্যাকেজ প্রযুক্তি হলো ষ্টল ফিডিং প্রযুক্তি ।

৩১.২.১ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য ছাগল নির্বাচন

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে খামার করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক ও রোগ মুক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ৬-১৫ মাস বয়সী ছাগী এবং ৫-৭ বয়সী পাঁঠা সংগ্রহ করতে হবে । ছাগল সংগ্রহ কালে ২৯.১ নং অধ্যয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে ছাগল নির্বাচন করতে হবে ।

৩১.২.২ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের ঘর

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ১০ বর্গ ফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন হয়। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরী হতে পারে । ঘর নির্মানের সময় ২৮.৩ নং অধ্যয়ে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে ঘর নির্মান করতে হবে । ঘরটি বাঁশের তৈরী হলে শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে ।

৩১.২.৩ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্তকরণ

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনের জন্য সংগৃহীত ছাগলকে সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখ উচিৎ নয় । প্রথমে ছাগলকে দিনে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকী সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার) সরবরাহ করতে হবে । এভবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে । তবে ছাগল ছানাকে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এই ধরণের অভ্যস্ত করণের প্রয়োজন নেই ।

৩১.২.৪ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা

জন্মের পরপরই ছাগল ছানাকে পরিস্কার করে শাল দুধ খাওয়াতে হবে । এক মাস বয়স পর্যন্ত ছাগল ছানাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে । বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মা ছাগীতে দুধ কম থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগীর দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে । এ ছাড়া ছাগীর দুধ পাওয়া না গেলে বিকল্প দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার

খাওয়াতে হবে (টেবিল-৩১.২) । দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে । এক হতে দেড় কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন । ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে । বাচ্চার বয়স ২-৩ মাস হলে বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে । সাধারণতঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায় । বাচ্চার ১ মাস বয়স হতে ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করাতে হবে । ছাগল ছানার পরিচর্যা সম্পর্কে বিস্তারিত ৩২ নং মড্যুলে আলোচনা করা হয়েছে ।

৩১.২.৫ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো

ছাগল সাধারণতঃ তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে । এই খাদ্যের মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুড়া, ভূষি, চাল, ডাল, ছোলা ইত্যাদি) থাকতে হবে । একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার প্রদান করতে হবে (টেবিল-৩১.৪)। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয় । একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন ।

উপাদান	শতকরা হার
গম/চাল/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
গমের ভূষি/আটা/ কুড়া	২৪.০০
খেসারী/মাসকালাই/অন্য ডালের ভূষি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা প্রভৃতির খৈল	২০.০০
শুটকি মাছর গুড়া	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবন	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

টেবিল-৩১.৪ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

৩১.২.৬ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে ঘাস, খড় খাওয়ানো

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হবে । দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠাকে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস প্রদান করা প্রয়োজন । ঘাস পাওয়া না গেলে খড়কে ২-৩ ইঞ্চি পরিমান কেটে ইউরিয়া মোলাসেস দিয়ে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে । এ বিষয়ে ৩১.১.৭ ঃ নং অনুচ্ছেদে বিস্ত্মারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

৩১.২.৭ ঃ খাসী করানো

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো অধিকতর মাংস উৎপাদন । তাই এ পদ্ধতির খামারে প্রজনন উপযোগী কয়েকটি পাঁঠা রেখে বাকী সব পুরুষ ছাগলকে খাসী করানো হয়ে থাকে । খাসী করানোর মাধ্যমে ছাগলের মাংস গন্ধমুক্ত ও সুস্বাদু হয় । খাসীকরণের ফলে চামড়ার গুনগত মানও বৃদ্ধি পায় । এর ফলে ছাগল শান্ত ও নম্র স্বভাবের হয় এবং অনেক ছাগল একত্রে পালন সহজতর হয় । ২-৪ সপ্তাহ বয়সে

পাঁঠা বাচ্চাকে খাসী করানো উত্তম । খাসী করার জন্য বার্ডিজোস ক্যাস্ট্রেটর, রাবার রিং বা অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে । এ ব্যাপারে ২৯.৫ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । খাসী করানোর পর ড়্গতস্থানে মাছি বা অন্য কোন পোকা বা আঠালি যেন না বসে সেজন্য টিংচার অব আয়োডিন দিয়ে পরিস্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে ।

৩১.২.৮ ঃ পাঁঠা ব্যবস্থাপনা

পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমানে ঘাস খাওয়ালেই চলে । তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় পাঁঠাকে ওজনভেদে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমান দানাদার খাবার দিতে হবে । প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম পরিমান গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন । কোন ভাবেই পাঁঠার শরীরে চর্বি জমতে দেয়া উচিৎ নয় । প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে

৩১.২.৯ ঃ ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, খামারের জৈব নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

খামারের সব ছাগলকে বছরে কমপড়্গে দুই বার (বর্ষা ও শীতের শুরম্নতে) কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে । ছাগলের মারাত্মক রোগ যেমন- পিপিআর, গোটপক্স হলে দ্রম্নত নিকটস্থ প্রাণি হাসপাতাল বা ভেটেরিনারিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এ ছাড়া ছাগলের তড়কা, গলা ফুলা, এন্টারোটক্সিমিয়া, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া হতে পারে । সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । ছাগলের টিকাদান কর্মসূচী অনুসরণ করলে অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব (টেবিল-৩০.১) ।

জৈব নিরাপত্তাঃ খামারে নতুন ছাগল আনার ড়্গেত্রে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র পর্যবেড়্গাণ (কোয়ারেন্টাইন) করতে হবে । কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাক্সিন দিয়ে ছাগল খামারে অন্যান্য ছাগলের সাথে রাখা যাবে । অসুস্থ ছাগলকে পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রম্নত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে । ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে । সকল ছাগলকে বছরে ৫-৬ বার ০.৫% ম্যালাথায়ন দ্রবণে চুবিয়ে বহিঃপরজীবি মুক্ত রাখতে হবে । প্রজননশীল পাঁঠা ও ছাগীকে বছরে দুইবার ১.০-১.৫ মি.লি. ভিটামিন এ, ডি. ই ইনজেকশন দিতে হবে ।

৩১.২.১০ ঃ ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালিত ছাগল বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের মধ্যে খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয় । এ সময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে অথবা খাসীর মাংস প্রক্রিয়াজাত করেও বিক্রি করা যেতে পারে ।

সূত্রঃ

১. সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে দেশী ছাগল পালন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা, জুন, ২০০১
২. ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা, মার্চ, ২০০৩

মডিউল - ৩২ ঃ
ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে করণীয়

ধারণা করা হয় যে বর্তমানে বাংলাদেশে ছাগলের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি । দেশের মোট ছাগলের শতকরা ৪৫ ছাগীই বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম । প্রতি বৎসর দেশে যে পরিমান ছাগলের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে থাকে তার প্রায় ৩০ ভাগই বিভিন্ন কারণে মারা যায় । এতে দেশ বিপুল পরিমান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে । অথচ ছাগল ছানার উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চা মৃত্যুর হার রোধ করা সম্ভব । ছাগল ছানার জন্মকালীন ওজন, মৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও বিপাকীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ছাগী ও প্রজননকালে ব্যবহৃত পাঁঠার প্রজনন ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল । প্রজননকালীন সময় ছাগীর দৈহিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ । ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী সাধারণতঃ ৪-৫ মাস বয়সের মধ্যে গরম হয় । এসময় প্রজনন না করানো ভাল । ছাগীর দৈহিক ওজন কমপক্ষে ১২-১৩ কেজি হলে তাকে প্রজনন করানো উচিৎ । অন্যথায় কম দৈহিক ওজনের ছাগীকে প্রজনন করালে প্রসবকৃত বাচ্চার ওজন কম হয়ে থাকে যা বাচ্চা মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ । এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বা কম ওজনের সময় গর্ভধারণ করলে ছাগীর দুধ উৎপাদন কম হয়, যা বাচ্চার বেঁচে থাকার ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না । ফলে জন্মের কয়েকদিন পরেই ছাগল ছানার মৃত্যু ঘটে । আবার ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী এক সাথে ৩-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে । কিন্তু ছাগীর দুধের বাট দুটি হওয়ায় সবগুলো বাচ্চা একসাথে মায়ের দুধ খেতে পায় না । ফলে অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চা আরও দূর্বল হয়ে পড়ে । বাচ্চা মৃত্যুর হার রোধ করতে হলে ছাগীর গর্ভকালীন সময় হতে প্রসব পরবর্তী সময় পর্যন্ত মা ও ছাগল ছানার বিশেষ যত্ন নিতে হবে । নিম্নে ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো ।

৩২.১ ঃ ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে ছাগীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে ছাগীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধে ছাগীর গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী সাধারণতঃ প্রতিবারে ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে । তাই গর্ভবতী ছাগীকে পর্যাপ্ত সুষম ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে । এতে বাচ্চা ও ছাগীর রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে এবং ছাগল ছানার জন্মকালীন ওজন বৃদ্ধি পাবে । অন্যথায় জন্মের সময় বাচ্চা ওজনে কম ও দূর্বল হতে পারে; ফলে বাচ্চা মৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে ।
- গর্ভেধারণের প্রথম তিন মাসে ছাগীকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং ছাগীর স্তন টিস্যুর বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। গর্ভের শেষ দুই মাসে ছাগী ও বাচ্চার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্য, ভিটামিন ও মিনারেল সাপ্লিমেন্ট এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিৎ । এতে গর্ভস্থ বাচ্চার সুষম বৃদ্ধি ঘটবে এবং প্রসবকৃত বাচ্চার মৃত্যুর হার কমে যাবে ।
- যে সব ছাগীকে পূর্বে পিপিআর, গোটপক্স, একথাইমা, ব্রুসেলোসিস প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় নি তাদেরকে গর্ভের ৫ম মাসে উক্ত টিকাসমূহ প্রদান করতে হবে । এতে বাচ্চা তার মা থেকে উক্ত রোগসমূহের প্রতিষেধক পাবে ।
- গর্ভের শেষ ১-২ সপ্তাহে ছাগীকে ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ।
- গর্ভকালীন সময়ে অপুষ্টিতে আক্রান্ত বা ক্ষীণ স্বাস্থ্যের ছাগীকে সুষম খাবার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে একটি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ছাগীর আমিষের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে এবং গর্ভস্থ বাচ্চাও সবল হবে ।

গর্ভকালীন সময়ে ছাগীকে নিম্নের ছক অনুসারে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হলে ছাগী সুস্থ সবল থাকবে এবং নবজাতক ছাগল ছানার ওজন বেশী হবে ।

ছাগীর ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম/দিন)	ঘাস (কেজি/দিন)	পানি (লিটার/দিন)
১৫	৮০০	২.২৫	১.৫
২০	৯০০	২.৪	১.৫
২৫	১০০০	২.৬	১.৫
৩০	১১০০	২.৮	২.০
৩৫	১২০০	৩.০	২.০
৪০	১২৫০	৩.৫	২.০

টেবিল ৩২.১ ঃ গর্ভকালীন সময়ে ছাগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৩২.২ ঃ ছাগীর প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগীর প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগীর প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- আসন্ন প্রসবা ছাগীকে প্রসবের কমপক্ষে ১-২ সপ্তাহ পূর্বে দলের অন্যান্য ছাগল হতে আলাদা করে একটি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, জীবানুমুক্ত ঘরে (প্রসুতি ঘর) রাখতে হবে ।
- প্রসুতি ঘরের মেঝে শুকনো, পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত খড়-বিচালী বা চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম হতে ছাগীকে রক্ষা করতে হবে ।
- মশা-মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের উৎপাত হতে ছাগীকে রক্ষা করতে হবে ।
- ছাগীকে যথারীতি সুষম ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে ।
- প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ছাগীর পিছনের অংশ ও ওলান পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর ০.৫-১.০% দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে-মুছে দিতে হবে ।
- এসময় ছাগীর পাশে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রসবে সহায়তা করতে হবে (যেমন-বাচ্চার পা টেনে বের করা) ।
- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চাকে মায়ের সামনে দিতে হবে যাতে ছাগী বাচ্চার শরীর চেটে পরিস্কার করতে পারে। বাচ্চার নাক শ্লেষ্মাতে আটকে থাকার কারণে দম বন্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে তাই প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীর ও নাকের শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফু দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহযোগীতা করতে হবে।
- শীতের সময় দ্রুত বাচ্চার শরীর মুছে না দিলে শীতে বাচ্চার শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা দ্রুত হারাতে থাকে এবং বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে মারা যায় । এজন্য বাচ্চাকে উষ্ণ স্থানে অর্থ্যাৎ খড় বা চটের উপর রেখে চারদিক চট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে অথবা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- বাচ্চা প্রসবের পরপরই বাচ্চার নাভি ২-৩ সে.মি. রেখে বাকী অংশ কেটে দিতে হবে এবং উক্ত স্থানে টিংচার অব আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে ।
- প্রসবের পর ছাগীকে স্যালাইন খেতে দেওয়া ভাল ।

- ছাগীর জরায়ুতে যাতে ইনফেকশন না হয় সেজন্য জননাঙ্গকে ০.৫-১.০% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে । প্রয়োজনে জরায়ুতে এন্টিবায়োটিক বোলাস প্রয়োগ করতে হবে ।

৩২.৩ ঃ ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- সদ্য প্রসূত বাচ্চার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন শক্তি । নবজাত ছাগল ছানা শক্তি পায় মায়ের দুধ হতে । তাই প্রসবের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে ছাগল ছানাকে মায়ের শাল দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে । শাল দুধ দোহন করে বোতলে খাওয়ানো যেতে পারে ।
- খেয়াল রাখতে হবে যে সকল বাচ্চা যেন সমভাবে দুধ পায় । অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চাকে নিজের হাতে ধরে মায়ের দুধ খাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে । জন্মের পর ১ম ৪-৫ দিন বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে ।
- জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১ কেজির কম হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি এক সপ্তাহ পর্যন্ত চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে বাচ্চার শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বাচ্চা মৃত্যুর হার কমে যায় ।
- ছাগীর দুধ উৎপাদন কম কিন্তু বাচ্চার সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি কৃত্রিম উপায়ে গাভীর দুধ, বার্লি, পাউডার মিল্ক, ভাতের মাড় প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে।
- গরুর দুধ পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে ছাগল ছানাকে মিল্ক রিপ্লেসার তৈরী করে দিনে ৩-৪ বার খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ননীমুক্ত গুড়া দুধ (স্কিম মিল্ক) ৭০ ভাগ; চাল,গম বা ভূট্টার গুড়া ২০ ভাগ, সয়াবিন তেল ৭ ভাগ, লবন ১ ভাগ, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ১.৫ ভাগ এবং ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ভাগ থাকে । উক্ত মিশ্রণের একভাগ, নয়ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে ভালমত ফুটানোর পর ঠান্ডা করে ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে।
- ছাগল ছানার ১৫ দিন বয়স হতে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্য এবং আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি) খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে ।
- যে সকল ছাগল ছানা দীর্ঘ সময় ধরে মায়ের অপর্যাপ্ত দুধ পাওয়ার কারণে দূর্বল হয় তাদেরকে অন্যান্য সুষম খাবার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে কাঁচা বা সিদ্ধ ডিম খাওয়ানো যেতে পারে । এতে ছাগল ছানার আমিষের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে এবং বাচ্চা সুস্থ ও সবল হবে ।

ছাগল ছানাকে নিম্নের ছক অনুসারে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা হলে ছাগল ছানা সুস্থ সবল থাকবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে ঃ

বয়স	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানোর পরিমান	প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর পরিমান	কাচা ঘাস
০-১৪ দিন	১৫০ গ্রাম	-	-
১৫-৩০ দিন	১৫০ গ্রাম	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৩১-৪২ দিন	১৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমান
৪৩-৫৬ দিন	১৩০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৫৭-৭০ দিন	১১০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৭১-৯০ দিন	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

টেবিল ৩২.২ ঃ বয়সভেদে ছাগল ছানার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৩২.৪ ঃ ছাগল ছানার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

- ছাগল ছানার মৃত্যু হার রোধের জন্য বাসস্থান ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।
- সদ্য প্রসূত ছাগল ছানাকে পরিস্কার পরিচ্ছন ও শুষ্ক জায়গা (ব্রুডিং পেন) তে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- শীতের সময় মেঝেতে ছালা বা খড় বিছিয়ে মার সাথে ছাগল ছানাকে রাখতে হবে ।
- প্রয়োজনে ছাগল ছানার শরীর গরম কাপড়া বা ছালা দিয়ে ঢেকে দেয়া যেতে পারে ।
- ছাগলের ঘরের বেড়া বা দেয়াল চট দিয়ে ঢেকে দেয়া দেতে পারে যাতে ঘর হতে শীত শীত ভাব দূর হয় ।
- প্রতিদিন খাদ্য ও পানির পাত্র পরিস্কার করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘর ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে না হয় ।
- শীতে বা বৃষ্টির সময় ছাগর ছানাকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিৎ নয় । এতে ঠান্ডা লেগে ছাগল ছানার নিউমোনিয়া হতে পারে ।
- বড় প্রাণীর আক্রমন হতে ছাগল ছানাকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে ।

৩২.৫ ঃ ছাগল ছানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ছাগল ছানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ছাগল ছানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।

ছাগল ছানার পরজীবি নিয়ন্ত্রণ ঃ
বিভিন্ন কারণে ছাগল ছানার শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন হতে পারে । এর ফলে বাচ্চা রক্তশূন্যতায় ভুগে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং মারা যায় । এ সব পরজীবির আক্রমন প্রতিরোধের জন্য ছাগল ছানাকে উঁকুন নাশক সাবান দিয়ে অথবা ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে গোসল করাতে হবে । ছাগল ছানার বয়স ২ মাস হলেই প্রতি সপ্তাহে দুইবার একে সাধারণ পানিতে গোসল করাতে হবে । শরীরে উঁকুন, আঠালী, মাইট প্রভৃতি পরজীবির সংক্রমন দেখা দিলে মাসে দুইবার ০.৫% ম্যালাথিয়নের পানিতে বাচ্চাকে গোসল করাতে হবে । গোসলের পরপরই ছাগল ছানার শরীর কাপড় বা ছালা দিয়ে মুছে দিতে হবে ।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছাগল ছানার পেটে গোল কৃমি, ফিতা কৃমি এবং যকৃত কৃমিসহ বিভিন্ন ধরণের কৃমি হতে থাকে । এর ফলে ছাগলের খাদ্য হজম কমে যায় এবং হজমকৃত খাদ্য শোষণে ব্যাঘাত ঘটে । এক পর্যায়ে বাচ্চা অপুষ্টিতে দূর্বল হয়ে মারা যেতে পারে । তাই বাচ্চার বয়স একমাসের অধিক হলে প্রতি চার মাস পরপর পায়খানা পরীক্ষা করে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

ছাগল ছানার নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্রণ ঃ
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস প্রভৃতি জীবানু দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ছাগল ছানার নিউমোনিয়া হতে পারে । প্রচন্ড শীত, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতকালীন সময় এবং ভেজা স্যাঁতসেঁতে ও অপরিস্কার বাসস্থান এ রোগের

সংক্রমন ত্বরান্বিত করে । এ ছাড়া শ্বাস নালীতে খাবার বা ঔষধ জাতীয় কোন পদার্থ ঢুকে গেলে এসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে । নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলো হচ্ছে ঃ

- ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও অল্প জ্বর (প্রধান লক্ষণ)
- শ্বাস প্রশ্বাসের সময় শব্দ হওয়া (ঘড়ঘড় শব্দ)
- রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট
- ঘন ঘন কাশি এবং কাশির সময় বুকে ব্যাথা
- নাক দিয়ে সাদা ফেনাযুক্ত সর্দি বের হওয়া
- খাদ্য গ্রহণে অরুচি ও অনীহা
- বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা এক পর্যায়ে কমে যাওয়া এবং শ্বাসকষ্টে মৃত্যুবরণ

ছাগল ছানার নিউমোনিয়া রোগ হলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এর চিকিৎসা করাতে হবে । নিউমোনিয়া রোগ কোন একক সুনির্দিষ্ট জীবানু দ্বারা হয়না বলে টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায় না । খামারের উন্নত ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং অতিরিক্ত শীত, বৃষ্টি ইত্যাদি হতে ছাগল ছানাকে রক্ষার মাধ্যমে নিউমোনিয়া রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব । ঠান্ডা এড়ানোর জন্য শীতকালে গরম কাপড় বা চট দিয়ে ছাগল ছানাকে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড়/চট বিছিয়ে তার উপর বাচ্চাকে রাখতে হবে ।

ছাগল ছানার ডায়রিয়া/পেটের পীড়া নিয়ন্ত্রণ ঃ

ছাগল ছানা জন্মের ১২-৪৮ ঘন্টার মধ্যে ই. কোলাই নামক এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পেটের পীড়া রোগ হয় । বাচ্চার জন্মের পরপরই শাল দুধ খাওয়ালে এই রোগ হয় না । পেটের পীড়ার লক্ষণঃ

- সাদা বা হলুদ বর্ণের পাতলা পায়খানা হয়
- মুখ দিয়ে অত্যধিক লালা পড়ে
- বাচ্চার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়
- বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে যায়
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়
- পেটে গ্যাস জমে যেতে পারে, ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
- সময় মত চিকিৎসা না করালে ১২-১৪ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা মারা যায়

ছাগল ছানার পেটের পীড়া হলে একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এর চিকিৎসা করাতে হবে । দেহের পানি শূন্যতা পূরণের জন্য আক্রান্ত ছাগল ছানাকে ঘন ঘন স্যালাইন খাওয়াতে হবে ।

ছাগল ছানার টিকা প্রদান ঃ

রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম । ছাগল ছানার কয়েকটি মারাত্মক রোগ টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব । ছাগল ছানার মৃত্যুহার রোধ করতে হলে সময়মত এসব টিকা প্রয়োগ করতে হবে । নিম্নে বিভিন্ন বয়সে ছাগল ছানার টিকার বিবরণ ছক আকারে দেখানো হলো ঃ

টিকার নাম	প্রয়োগের বয়স		
	১ম ডোজ	২য় ডোজ	৩য় ডোজ
পিপিআর টিকা	৪ মাস		
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস		
গোট পক্স টিকা	৫ মাস		
এন্টারো টক্সিমিয়া টিকা	৬ মাস		
কন্টাজিয়াস একথাইমা টিকা	১-৩ দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস

টেবিল ৩২.৩ ঃ ছাগল ছানার টিকাদান সময়সূচি

মডিউল - ৩৩ ঃ
ভেড়া পালন

৩৩.১ঃ বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সুবিধা ও সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

ভেড়া ছাগলের মতই একটি সম্ভাবনাময় চতুষ্পদ প্রাণী । সুদূর অতীত কাল হতে মানুষ পশম ও মাংসের জন্য ভেড়া পালন করে আসছে । বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশী ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । তবে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে ভেড়া পালন উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী । বাংলাদেশে ভেড়া পালন একটি লাভজনক পেশা হতে পারে । ভেড়ার খামারে বিনিয়োগকৃত অর্থ অতি অল্প সময়ে উঠে আসে ।

ভেড়া পালনের সুবিধাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১. অল্প জায়গাঃ ভেড়া পালনের জন্য খুব বড় চারণভূমি না হলেও চলে । অল্প জায়গাতেই ভেড়া পালন করা সম্ভব।
২. খাদ্যঃ ভেড়া পালনের জন্য খুব বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয় না । বসত-বাড়ির আশেপাশের পতিত জমি, ক্ষেতের আইল এবং রাস্তার পার্শ্বের ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে এরা প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করতে পারে ।
৩. সহজ পরিচর্যাঃ ভেড়া পরিচর্যা সহজ । তাই ভেড়ার খামারে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমের প্রয়োজন হয়। ভেড়া শান্ত প্রাণী হওয়ায় একজন মহিলা বা বাচ্চা ছেলের পক্ষেও একসাথে অনেকগুলো ভেড়ার পরিচর্যা করা সম্ভব ।
৪. স্বল্প মূল্য/সহজ বিনিয়োগঃ ছোট প্রাণী হওয়ায় ভেড়ার একক মূল্য কম । তাই ভেড়া পালনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয় । ফলে দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষেও ভেড়া পালনে বিনিয়োগ করা সম্ভব ।
৫. মাংস উৎপাদনঃ বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে যে সব ভেড়া পালন করা হয় তা মূলতঃ মাংস উৎপাদনের জন্য । ভেড়ার মাংস সুস্বাদু । একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া হতে গড়ে ২৫-৩০ কেজি মাংস পাওয়া যায় ।
৬. পশম উৎপাদনঃ বাংলাদেশে স্থানীয় ভাবে পালিত ভেড়াগুলো উন্নত জাতের না হওয়ায় এদের পশমও উন্নত মানের নয় । তবে এসব ভেড়া হতে প্রাপ্ত পশম হতে রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে কম্বল তৈরী করা হয়।

বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সমস্যাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে যে সব ভেড়া পালন করা হয় তা উন্নত জাতের নয় । উচ্চ উৎপাদনশীল ভেড়া এদেশে পালন না করার কারণে এদের পশমের গুনগত মানও নিম্ন এবং গড় মাংস উৎপাদনও কম । ভেড়া পালন সংকান্ত জ্ঞানের অভাব এবং ভেড়া পালনে আগ্রহের অভাব এদেশে ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটি অন্যতম অন্তরায় । ভেড়ার খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেও এসব ভেড়া হতে কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না । এ ব্যাপারে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এদেশে পালন উপযোগী ভেড়া আমদানী করলে বাংলাদেশের খামারীগন ভেড়া পালন করে লাভবান হতে পারবে ।

৩৩.২ঃ ভেড়ার জাত ও শ্রেণী

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার জাত ও শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই প্যাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার জাত ও শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

আমরা পূর্বেই জেনেছি ভেড়া হতে দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদন করা হয়ে থাকে । দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়ার বিভিন্ন জাতের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়ে থাকে । **দুগ্ধ উৎপাদন কারী ভেড়ার উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হচ্ছেঃ**

১. ডরসেট
২. ফিনশিপ
৩. কুপওয়ার্থ
৪. পলিপে
৫. রোমানভ
৬. ফ্রিজিয়ান
৭. রাম্বুইলেট
৮. আইসল্যান্ডিক
৯. শ্রপশায়ার
১০. টারঘি ইত্যাদি

দুধ উৎপাদনের জন্য ইউরোপের অনেক খামারে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । ইউরোপ ও আমেরিকায় ফ্রেশ পনির ও ইয়োগার্ট তৈরীতে ভেড়ার দুধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বাচ্চা দেওয়ার পর প্রতি ল্যাকটেশনে একটি ভেড়ী গড়ে ১০০ দিন দুধ প্রদান করে থাকে । ইউরোপের দুগ্ধ প্রদানকারী ভেড়ার জাত হতে গড়ে ২ হতে ৩.৫ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুগ্ধ প্রদানকারী ভেড়া হতে গড়ে প্রতিদিন ১ লিটার দুধ পাওয়া যায় ।

চিত্র-৩৩.১ঃ লিংকন জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.২ঃ রাম্বুইলেট জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৩ঃ রোমানভ জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৪ঃ টারঘি জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৫ঃ ডরসেট জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৬ঃ রোমনি মার্শ জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৭ঃ আইসল্যান্ডিক জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৮ঃ মেরিনো জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.৯ঃ ফ্রিজিয়ান জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.১০ঃ কটসওয়াল্ড জাতের ভেড়া

চিত্র-৩৩.১১ঃ লোহি জাতের ভেড়া

পশম উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়ার নিম্নবর্ণিত শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছেঃ

সরু পশম উৎপাদনকারী ভেড়া -	ক) মেরিনো
	খ) রাম্বুইলেট
লম্বা পশম উৎপাদনকারী ভেড়া -	ক) রোমনি মার্শ
	খ) লেষ্টার
	গ) লিংকন
	ঘ) কটসওয়াল্ড
মাঝারী পশম উৎপাদনকারী ভেড়া-	ক) ডরসেট
	খ) সেভিয়ট
	গ) শর্পশায়ার
	ঘ) সাফোক
কার্পেট পশম উৎপাদনকারী ভেড়া-	ক) ব্ল্যাক ফেস্‌ড
	খ) লোহি
	গ) হাইল্যান্ড
ফার পশম উৎপাদনকারী ভেড়া -	ক) কারাকুল

মেরিনো জাতের প্রতিটি ভেড়া হতে বছরে গড়ে ৮-১০ কেজি পশম পাওয়া যায় । রোমনি মার্শ জাতের ভেড়া হতে প্রতি বছর গড়ে ৫-১২ কেজি পশম পাওয়া যায় ।

মাংস উৎপাদনের জন্য বিশ্বের অনেক দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য । মাংসল জাতের একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া হতে গড়ে ৪৫-৮০ কেজি মাংস পাওয়া যায় । উল্লেখযোগ্য **মাংসল জাতের ভেড়াগুলো হচ্ছেঃ**

ক) মেরিনো	(দৈহিক ওজনঃ ৬৫-১০০ কেজি)
খ) রোমনি মার্শ	(দৈহিক ওজনঃ ৮৫-১১০ কেজি)
গ) লিংকন	(দৈহিক ওজনঃ ৮০-১২০ কেজি)
ঘ) সেভিয়ট	(দৈহিক ওজনঃ ৬০-১০০ কেজি)

বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে যে সব ভেড়া পালন করা হয় তা উন্নত জাতের নয় । এগুলোর মধ্য হতে উচ্চ উৎপাদনশীল ভেড়া সনাক্ত করে উন্নত জাতের সাথে ওগুলোর সংকরায়নের মাধ্যমে এদেশে ভেড়ার জাত উন্নয়ন করা প্রয়োজন ।

৩৩.৩ ঃ ভেড়ার বাসস্থান ও পরিচর্যা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার বাসস্থান ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার বাসস্থান ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

প্রচলিত পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করলে ভেড়ার জন্য আলাদা বিশেষ কোন ঘরের প্রয়োজন হয় না । গোয়াল ঘর, মানুষের থাকার ঘরের এক পার্শ্বে কিংবা ঘরের পাশের বারান্দায় ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে । তবে বেশী সংখ্যায় পালন করলে আলাদা ভাবে ভেড়ার ঘর নির্মান করা উচিৎ । বাঁশ, ছন বা খড় দিয়ে ভেড়ার ঘর তৈরী করা যেতে পারে । ঘরের মেঝে উঁচু করে তৈরী করতে হবে যাতে মেঝে সব সময় শুকনো থাকে ।

প্রয়োজনে ঘরে মাচা তৈরী করা যেতে পারে যাতে ঘর স্যাঁতসেঁতে না হয় । শুকনো খড় বা ছালা দিয়ে ভেড়ার বিছানা করে দেয়া যেতে পারে; এতে মেঝে শুকনো থাকবে । রোগ ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য ভেড়ার ঘর নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন ।

৩৩.৪ ঃ ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

ভেড়া থেকে ভাল উৎপাদন পেতে হলে চাহিদা মোতাবেক সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে । দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদনে প্রচুর প্রোটিন বা আমিষের প্রয়োজন হয় । তাই ভেড়া হতে অধিক মাংস ও পশম পেতে হলে ভেড়াকে ঘাস, খড় ও লতা-পাতা খাওয়ানোর সাথে সাথে প্রোটিন জাতীয় দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে ।

ভেড়াকে নিম্ন বর্ণিত খাদ্য পরিমানমত খাওয়ানো যেতে পারে ঃ
ক) সবুজ ঘাস/রাফেজ জাতীয় খাদ্যঃ

- নেপিয়ার ঘাস
- পারা ঘাস
- ভূট্টা ঘাস
- গিনি ঘাস
- আলফা আলফা
- কাউপি
- বাঁধা কপি
- সূর্যমুখী গাছ, সরিষা গাছ, গোল আলু গাছ, আনারসের মাথা প্রভৃতি ।

খ) দানাদার খাদ্য

- খৈল (তুলাবীজ, নারকেল, তিল, তিসি, সয়াবিন, সরিষা, বাদাম প্রভৃতির খৈল)
- বীজ (সয়াবিন, জোয়ার, তুলাবীজ ইত্যাদি)
- ভূষি (গম, ভূট্টা, ছোলা ইত্যাদি)
- শুটকি মাছের গুড়া
- হাড়ের গুড়া
- রক্তের গুড়া
- গম ভাঙা, চাল ইত্যাদি ।

১.	সবুজ ঘাস	–	১.০ কেজি
২.	ঘাসের সাইলেজ	–	১-১.৫ কেজি
৩.	খড় (ভূট্টা, জোয়ার)	–	পরিমান মত
৪.	তিল/তিসি/সয়াবিন গুড়ো	–	১২০ গ্রাম
৫.	চুনা পাথর গুড়ো	–	০.২৫ আউন্স

টেবিল-৩৩.১ঃ ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি ভেড়ার খাদ্য ফর্মুলা

৩৩.৫ ঃ ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্যঃ প্রশিক্ষণার্থীদের ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ।
অর্জনঃ এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীগন ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

লাভজনকভাবে ভেড়া পালন করতে হলে এর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । ভেড়া হতে অধিক পরিমানে মাংস, দুধ ও পশম পেতে হলে যেমন একে সুষম খাবার সরবরাহ করা প্রয়োজন তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভেড়াকে রোগ ব্যাধি মুক্ত রাখা প্রয়োজন । স্বাস্থ্যসম্মতভাবে লালন পালন করলে ভেড়ার অনেক সংক্রামক রোগ দমন/নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

পরজীবি নিয়ন্ত্রণঃ
ভেড়ার পশমের ভেতওে উঁকুন, আঠালি ও মাইট জাতীয় পোকার আক্রমন হয়ে থাকে । এসব পোকা রক্ত চুষে খায় বলে ভেড়ার উৎপাদন ক্ষমতা বাধাগ্রস্থ হয় । টক্সাফেন, ম্যালাথিয়ন প্রভৃতি ইনসেক্টিসাইড প্রয়োগ করে ভেড়াকে এসব পোকার আক্রমন হতে মুক্ত রাখা সম্ভব । এসব ইনসেক্টিসাইড পানিতে গুলে ভেড়ার শরীরে স্প্রে করতে হবে । কিংবা পানিতে মিশিয়ে উক্ত পানিতে ভেড়াকে চুবাতে (ডিপিং) হবে । এসব ঔষধ খুবই বিষাক্ত বিধায় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঔষধ মিশানো পানি ভেড়ার মুখের ভিতরে, চোখে বা নাকে প্রবেশ না করে । এ ছাড়া অন্তঃপরজীবি হতে মুক্ত রাখার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে ।

সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণঃ

ভেড়ার রোগ ব্যাধির মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে । এগুলো হলো ঃ ক্ষুরারোগ, তড়কা, গলাফুলা, জলাতংক, বসন্ত, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি । নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা প্রদান করে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

ভেড়ার পশম বড় হলে কাঁচি বা মেশিন দিয়ে ছোট করে ফেলা উচিৎ । এতে ভেড়া যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তেমনি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় । পশম কাটা/ছাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ যাতে চামড়া/মাংস কাটা না পড়ে । কেটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা উচিৎ এবং এন্টি সেপটিক ব্যবহার করা উচিৎ যাতে সংক্রমন না হয় ।বাচ্চা প্রসবের পূর্বে ও পরে প্রসুতি ও নবজাতক ছানার বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিৎ । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাচ্চা প্রসব করালে প্রসবকালীন রোগ-ব্যাধি হতে ভেড়াকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয় । এ সময় মায়ের জন্য ও বাচ্চার জন্য বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিৎ ।